১

মহিলা ফিকহ

আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস

মহিলা ফিক্‌হ

প্রথম খণ্ড

www.bjilibrary.com

فقه النساء

محمد عطيه خميس

www.bjilibrary.com

মহিলা ফিক্‌হ

প্রথম খণ্ড

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস

অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৮৭

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৯২

১১শ প্রকাশ

জিলহাজ্জ	১৪৩১
অগ্রহায়ণ	১৪১৭
ডিসেম্বর	২০১০

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

فقه النساء -এর বাংলা অনুবাদ

MOHILA FIQH Volume-1 by Mohammad Atya Khamis. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only.

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধি বিধান পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আবার পুরুষ পুরুষ হবার কারণে তাদের জন্য মহিলাদের থেকে পৃথক কিছু বিধান রয়েছে এবং মহিলারা মহিলা হবার কারণে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু আলাদা বিধান।

প্রাচীন এবং আধুনিককালে লিখিত অধিকাংশ ফিক্‌হ গ্রন্থেই পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের শরয়ী বিধান একই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে মূলত আরবী ভাষায়। আর আমাদের দেশে সাধারণত পুরুষরাই মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে বিধায় মহিলা সমাজ তাদের জন্য শরীয়ত প্রদত্ত বিধিবিধান সরাসরি জানার ক্ষেত্রে দারুণভাবে পিছে পড়ে গেছে। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা শরয়ী বিধিবিধান এবং হুকুম আহকাম জানার ক্ষেত্রে রয়ে গেছে অজ্ঞ। একটি মুসলিম সমাজের জন্য এটা খুবই দুঃখজনক।

এ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে জাগরণ শুরু হয়েছে, তাতে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। আজ যেখানেই দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে, সেখানেই মহিলারাও এগিয়ে আসছে আল্লাহর দীনকে জানার, বুঝার এবং প্রতিষ্ঠার কাজে। কিন্তু মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য শরয়ী বিধিবিধান ও হুকুম আহকাম জানার ক্ষেত্রে রয়েছে চরম সংকট। কারণ, তাদের সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী বলতে গেলে তেমন একটা রচিতই হয়নি। অথচ আল্লাহর পথে এগিয়ে এসেছে যেসব মহিলা, আল্লাহর দীনকে বুঝার জন্য তাদের যে উদগ্র আকাঙ্খা, যে সুতীব্র পিপাসা তা মেটাবার পথ ও পাথেয় একেবারে সংকীর্ণ অপ্রতুল।

এই বিরাট প্রয়োজনটি মেটাবার পথেই একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মিশরের খ্যাতনামা আলিমে দীন মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস। তাও আল্লাহর পথে এগিয়ে আসা তরুণী, যুবতী ও মহিলাদের তীব্র তাগাদার তাড়নায়ই তিনি এ কাজে হাত দিয়েছেন। প্রণয়ন করেছেন 'ফিক্‌হুন নিসা'– মহিলা ফিক্‌হ। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর পথে এগিয়ে আসা মহিলাদের বড় উপকার করেছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার জানা মতে গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সমাদৃত হয়েছে মহিলাদের একান্ত আপন গ্রন্থ হিসেবে। এ গ্রন্থে ঃ

www.bjilibrary.com

(১) প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে কুরআন সুন্নাহ থেকে।

(২) প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে সাহাবায়ে কিরামের আছার থেকে।

(৩) মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ইমামগণের (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

(৪) কোনো বিশেষ মযহাবের প্রতি বিশেষ প্রবণতা প্রদর্শন করা হয়নি। ফলে ঃ

(ক) জ্ঞানী পাঠিকা এ গ্রন্থ পাঠ করে নিজেকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করার সুযোগ পাবেন।

(খ) সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদের মতামত পাঠ করে অধিকতর যুক্তিসংগত মত অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন।

(গ) বিশেষ কোনো মযহাবের অনুসরণ করতে চাইলে তাও করার পথ পেয়ে যাবেন।

(ঘ) সবচাইতে বড় কথা হলো, অধিকাংশ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর বক্তব্যসহ শ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদগণের মতামত জানার বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবেন।

বাংলাভাষী মুসলিম মহিলা সমাজ এ গ্রন্থটির সাহায্যে তাদের শরয়ী জ্ঞানের সংকট কাটাবার একটা বড় সুযোগ পেয়ে যাবেন বলে আশা করি। আর সে উদ্দেশ্যেই এর বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। দয়াময় রহমান এ কাজকে আমার আখিরাতে নাজাত লাভের উপায় বানিয়ে দিন। এর পাঠিকাদের শরীয়তের সঠিক বিধান মেনে চলার তৌফীক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম

১৯-১-১৯৯৩

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১. গ্রন্থকারের ভূমিকা ১৩
২. পবিত্রতা অর্জন ১৮
৩. দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাবের বর্ণনা ২৬
পেশাব নাজাস্ ২৮
শিশু যতো দিন খাদ্য গ্রহণ শুরু না করে ৩০
ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে অবকাশের কারণ ৩১
যে মা দুধ পান করায় তার জন্য বিশেষ বিধান ৩২
৪. রক্তের নাজাসত এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি ৩৪
৫. অযু ৩৭
পুরুষ কর্তৃক নারীকে স্পর্শ করা এবং মুসাফাহা করা ৩৭
অযু অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা ৩৯
৬. নখ পালিশ ৪২
৭. পরচুলা বা কৃত্রিম চুল লাগানো ৪৫
শরীয়তের বিধান ৪৫
ফকীহদের মতামত ৪৭
আলোচনার সার কথা ৪৯
মেইকআপ, আকৃতি পরিবর্তন এবং মুখমণ্ডল রঞ্জিন করা ৫১
কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করার বিধান ৫২
৮. মোজা বা পদাবরণীর উপর মাসেহ করা ৫৫
৯. বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা ৬০
তাফহীমুল কুরআনের বর্ণনা ৬১

মহিলাদের রক্ত সংক্রান্ত মাসআলা ঃ

১০. হায়েয ৬৫
হায়েযের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতভেদ ৭০
হায়েযের রক্ত হবার শর্ত ৭১
ঋতুকালের সময়সীমা ৭২
তুহরের ন্যূনতম সময় ৭৩
ঋতুকালের বিরতিকাল ৭৩
১১. নিফাস ৭৪
জমজ সন্তান প্রসব ৭৪

www.bjilibrary.com

নিফাসের মুদ্দত ৭৪
নিফাস চলাকালের বিরতি ৭৫
১২. ইস্তেহাযা বা কুরক্ত ৭৭
কুরক্ত যদি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে বসে ৭৭
মতপার্থক্যের কারণ ৮০
ইস্তেহাযার রোগী কিভাবে পবিত্র হবে ৮০
মতপার্থক্যের কারণ ৮২
ইস্তেহাযার রোগীর করণীয় ৮৩
ইস্তেহাযার রোগীর জন্য যেসব কাজ নিষেধ নয় ৮৩
ইস্তেহাযার রোগীর সাথে সহবাস ৮৪
মতভেদের কারণ ৮৫
১৩. গোসল ৮৬
যেসব কারণে গোসল ফরয হয় ৮৬
নবী করীম (স) কিভাবে গোসল করতেন ৮৭
মহিলাদের গোসলের নিয়ম ৮৮
গোসলের আরকান ৯০
ক. নিয়্যত ৯১
খ. পুরো শরীর ধোয়া ৯১
গোসলের অযু কিভাবে করবেন ৯১
পশমের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছানো ৯২
বিভিন্ন মযহাবের দৃষ্টিকোণ ৯২
সর্বত্র পানি পৌছানো ৯৫
কানফুলের বিধান ৯৫
গোসলের সুন্নাত ও মুস্তাহাব ৯৬
গোসলের আরো দু'টি মাসআলা ৯৮
হদছে আকবর অবস্থায় যেসব কাজ নিষেধ ৯৮
১. কুরআন তিলাওয়াত ৯৮
২. নামায এবং মসজিদে প্রবেশ করা ১০০
৩. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা ১০১
৪. হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া ১০৩
৫. হায়েয এবং নিফাস অবস্থার অন্যান্য মাসআলা ১০৫
৬, হায়েয নিফাস চলাকালে ই'তেকাফ করা ১০৬
৭. হায়েয নিফাস চলাকালে সহবাস ১০৬
ঋতুকালের সহবাসে রাসূলুল্লাহর ভয় প্রদর্শন ১০৮

www.bjilibrary.com

যখন গোসল করলেও পাক হয় না ১১০
১৪. প্রকৃতিগত পরিচ্ছন্নতা ১১১
গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা ১১২
খতনা করা ১১৬
বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা ১১৮
নখ কাটা ১১৯
১৫. নগ্নতা ও পোষাক ১২০
মহিলারা নামাযে শরীরের কোন্ কোন্ অংশ ঢেকে রাখবে ১২১
১৬. মাহরাম কারা ১২৭
স্বামীর পিতা ১২৯
স্বামীর পুত্র ১২৯
ভাই ১২৯
ভাইপো ও বোনপো ১২৯
চাচা-মামা ১৩০
নিজ মেলামেশার মহিলা ১৩১
দাস-দাসী ১৩২
বিনীত নির্লিপ্ত অধীনস্থ পুরুষ ১৩৪
সেই সব শিশু যাদের এখনো বুঝ হয়নি ১৩৬
১৭. সতরের সীমা ১৩৮
মাহরামদের সামনে সতরের সীমা ১৩৮
গায়রে মাহরামদের সামনে সতরের সীমা ১৩৯
বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখা ১৪৬
রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর কন্যা যয়নব ১৪৬
মুহাজির মহিলাগণ ১৪৭
আনসার মহিলাগণ ১৪৭
ফকীহদের মতামত ১৪৮
ফিক্‌হী মতামতের সারকথা ১৪৮
১৮. পোষাক এবং পোষাকের শর্ত ১৫১
জিলবাব ১৫২
জিলবাব কেমন হওয়া উচিত ১৫৩
পদাসংকোচের যীনত ১৬২
সুগন্ধীর যীনত ১৬৫
১৯. কণ্ঠস্বরের পর্দা ১৭১
কণ্ঠস্বরেরও কি পর্দা আছে? ১৭১
নামাযে মহিলাদের কণ্ঠস্বর ১৭২

www.bjilibrary.com

মহিলাদের আযান	৭১৪
ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া	১৭৪
পরপুরুষের সামনে গান গাওয়া	১৭৫
পরপুরুষের সামনে মহিলাদের গান গাওয়াকে যারা মুবাহ্ বলেন দলীল	১৭৮
তাদের পেশকৃত দলীলের জবাব	১৭৮
২০. মহিলাদের নামায সংক্রান্ত মাসআলা	**১৮২**
হায়েয নিফাস অবস্থায় নামায	১৮২
ঋতুবতী যখন পবিত্র হয়	১৮২
নিফাসওয়ালী এবং নামায	১৮৩
হায়েয ও নিফাস চলাকালে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা নাই	১৮৩
ইস্তেহাযার রোগীর নামাযের বিধান	১৮৫
ইস্তেহাযার বিরতির সময় নামায পড়া	১৮৫
ইস্তেহাযা রোগীর নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন	১৮৬
সারকথা	১৯০
ইস্তেহাযা রোগীর নামাযের সময় করণীয়	১৯১
মহিলারা কি আযানের জবাব দেবে?	১৯২
মহিলাদের ইকামত দেয়া	১৯৩
ইকামতের তাকবীর	১৯৩
মহিলাদের মসজিদে যাওয়া	১৯৫
উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) পক্ষ থেকে সতর্কতা	১৯৬
মহিলাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম	১৯৭
মাসআলাটি প্রসংগে ফকীহদের মতামত	১৯৮
জামাতের নামাযে মহিলারা কোথায় দাঁড়াবে?	১৯৯
মহিলাদের ইমামতী	২০০
ফকীহদের মতামত	২০১
ইমাম মহিলা কোথায় দাঁড়াবে?	২০৩
২১. মহিলাদের ঈদের নামায	**২০৪**
২২. মহিলাদের জানাযার নামায	**২০৭**
মহিলারা কি কফিনের সাথে যাবে?	২০৭
মাইয়্যেতের জন্য কান্নাকাটি করা	২০৮
মৃতের জন্য শোক পালন	২১১
মহিলারা কি কবরস্থানে যেতে পারে?	২১১
মহিলাদের কবরস্থানে যাবার ব্যাপারে মতভেদ	২১২

www.bjilibrary.com

মহিলা ফিক্‌হ
প্রথম খন্ড

www.bjilibrary.com

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি একটি মাত্র প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর সেই প্রাণটি থেকেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ আর নারী।" [সূরা ৪ আননিসা ঃ ১]

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১.গ্রন্থকারের ভূমিকা

কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা ও মহিমা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর সুদৃঢ় জ্ঞানভাণ্ডার আল কুরআনে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

(الحجرات : ١٣)

"হে মানুষ! একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। অতপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীতে পরিণত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। আসলে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সবচাইতে সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়-নীতির অধিকারী।"

[সূরা ৪৯ আল হুজুরাত ঃ ১৩]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ـ (المومن ٤٠)

"নেক কাজ যেই করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, মুমিন হয়ে থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সূরা ৪০ আল মুমিন ঃ ৪০]

মানব জাতির নেতা ও মুক্তিদূত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করছি। যিনি সত্য নবী, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য পথ প্রদর্শক। যিনি পুরুষকে নারীর প্রতি ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যিনি মহিলাদেরকে পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করেন, যে রাত জেগে নফল নামায পড়ে, স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। সে যদি উঠতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। ঐ নারীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুণা বর্ষণ করেন, যে রাত জেগে নফল নামায পড়ে এবং স্বামীকেও জাগায়। আর স্বামী উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।" [আবু দাউদ]

হে আল্লাহ! তুমি তেমনি সালাত, সালাম ও বরকত নাযিল করো মুহাম্মদ আল আমীনের (সা) প্রতি, যেমনি নাযিল করেছিলে সাইয়্যেদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি। তুমি স্বপ্রশংসিত এবং স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

আমাদের প্রতিষ্ঠান "শুব্বাবে সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘদিন থেকে মুসলিম মহিলাদের উত্তম প্রশিক্ষণ ও সঠিক পথ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কারণ, মহিলাদের সঠিক তালীম তরবিয়তের উপরই নির্ভর করে পরিবারের সংশোধন। আর পরিবারের সংশোধন হলেই জাতির সংশোধন হয়ে যায়। জনৈক কবি একটি চমৎকার কথা বলেছেন ঃ

এমন বিদ্যানিকেতন মায়ের কোল মানবের
যদি সংশোধন করে নাও তারে,
জেনে রাখো জাতিকে তারা মহামানব
অনায়াসে উপহার দিতে পারে।

যারা জগতের সেরা শিক্ষাবিদ, যাদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়, তাদের আসল শিক্ষক তাদের মা। আপনারা কন্যাদের সুশিক্ষা দিন। প্রাচ্য দেশসমূহের পশ্চাতে পড়ে থাকার আসল কারণ নারী জাতির সঠিক শিক্ষার অভাব।

মুসলিম উম্মাহর উজ্জ্বল ভবিষ্যত আর ইসলামের বিজয়, এই দু'টি জিনিস নির্ভর করে এমন একটি বংশধর তৈরী করার উপর, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের শক্তিতে হবে বলীয়ান। তাকওয়া ও মহান নৈতিক গুণাবলী হবে যাদের ভূষণ। যাদের জীবন হবে অনাবিল পূত পবিত্র ও নিষ্কলুষ। যারা হবে শৌর্যবীর্যের অধিকারী এবং দুর্জয়

www.bjilibrary.com

বীর সৈনিকের মতো সাহসী। আর এ রকম একটি জেনারেশন ততোদিন পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব নয়, যতোদিন না এমনসব মুসলিম নারী পুরুষ তৈরী হবে, যাদেরকে সঠিক অর্থে মুসলিম বলা যেতে পারে।

অতীতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশগুলোতে বিভিন্ন রকম ফিতনা সৃষ্টি করে গিয়েছিল। তারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অসংখ্য ভাংগন ও বিপর্যয়ের কারণ ছড়িয়ে দিয়েছিল। অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্রসার ঘটিয়ে দিয়েছিল। তাদের নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার যে নোংরা সভ্যতা, তা আমাদের দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষার ব্যাপারে উম্মাহকে গাফিল করে দিয়েছিল।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা মুসলিম মহিলাদেরকে ধ্বংসের গহ্বর থেকে টেনে উদ্ধার করবো। ইসলামের সঠিক শিক্ষার আলোকে তাদের গড়ে তুলবো। যাতে করে আমাদের সমস্ত ঘর, আমাদের সমস্ত পরিবার ইসলামের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার দূর্গে পরিণত হয়।

আজ আমরা এমন সব আলামত দেখছি, যেগুলো ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করছে। নিকট অতীতের তুলনায়ও বর্তমানে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ইসলাম তথা আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে তারা আত্মনিয়োগ করছে। বিশেষ করে এই অশ্লীলতার সয়লাবের যুগে ইসলামী পর্দার বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে বীরাংগনার পরিচয় দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যেও এই পবিত্র প্রবণতা ব্যাপক সম্প্রসারিত হতে চলেছে। এই অবস্থা ইসলামের শত্রুদের বিচলিত করে তুলেছে। একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যায়নরত পর্দানশীন ছাত্রীদের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, প্রায় ছয় হাজার ছাত্রী পর্দার বিধান অনুসরণ করে। এই সব ছাত্রী এবং আরো অসংখ্য মহিলার অন্তরে ইসলামী বিধি বিধান জানার প্রচণ্ড আগ্রহ বিদ্যমান। তাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে এমন অসংখ্য প্রশ্ন এসে পৌছুতে থাকে, যেগুলোতে মেয়েদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী বিধি বিধান জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এসব মহিলা ও ছাত্রীরা জানতে চাচ্ছে, ইবাদত ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মহিলাদের জন্য কী বিধান দিয়েছেন? ইসলাম মহিলাদেরকে কি কি অধিকার দিয়েছে? তাদের উপর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে? মোট কথা, মহিলাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের দীনী বিষয়াদি সম্পর্কে আমার কাছে ব্যাপকহারে প্রশ্ন এসে পৌঁছে।

এ অবস্থা দেখে আমার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে, অন্যান্য মহিলাদের অন্তরে নিশ্চয়ই এ ধরনের নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। মহিলাদের এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আমি এ গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছি।

এ গ্রন্থে কেবল ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী বিষয়েরই বিধি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ মসলা মাসায়েলের পরিবর্তে বিশেষভাবে মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত হুকুম আহকামেরই আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে আরেকটি বিশেষ কাজ করেছি। তাহলো মাসআলা আলোচনার ক্ষেত্রে চার মযহাবের দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরেছি। এটা এ জন্য করেছি যাতে করে এ গ্রন্থের পাঠিকাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হয় এবং তারা মনের সন্তুষ্টি সহকারে কোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন।

মযহাবগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো মতপার্থক্য নেই। মতপার্থক্য হয়েছে নিছক প্রাসংগিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে। কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে চার মযহাবের যে আলিমই কোনো মত দিয়েছেন, সে মতের সপক্ষে অবশ্যি দলীল প্রমাণ বর্তমান রয়েছে।

আমি আশা করি, এ গ্রন্থে আমি আমার বোন ও কন্যাদের জন্য সেই সকল বিষয়েরই সমাধান পেশ করে দিয়েছি, যা সম্ভবত তাদের জানা ছিলনা। এতে দীনী জ্ঞানের যে দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ ছিলো, তা খুলে দিয়েছি। এই আশায় তা করেছি যে, তারা সঠিক পন্থায় ইবাদত করবে, জীবন যাপনের রীতিপদ্ধতিকে পরিশুদ্ধ করে নেবে এবং এমন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করবে যাতে করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

www.bjilibrary.com

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ -

(ال عران : ١٨٥)

"যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হলো এবং প্রবেশ করানো হলো জান্নাতে, সে-ই কামিয়াব হলো।" [আলে ইমরান ঃ ১৮৫]

হে আল্লাহ! প্রতিটি মুসলিম বোন ও কন্যাকে তোমার আনুগত্য করার এবং তোমার সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দাও।

মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
চেয়ারম্যান
শুব্বাবু সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (সা)

www.bjilibrary.com

২. পবিত্রতা অর্জন

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

(اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ - مسلم)

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" [মুসলিম]

আসলেই পবিত্রতা সেইসব ভিত্তি প্রস্তরসমূহের একটি, যেগুলোর উপর দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ জন্যেই নবী করীম (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম অহীতেই বলা হয়েছে ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড থেকে।" [আলাক ঃ ১-২]

অতপর দ্বিতীয় যে অহী অবতীর্ণ হয়, তাতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ

"হে আবৃত শয্যাগ্রহণকারী! উঠো এবং সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করো। স্বীয় পরিধেয় পবিত্র রাখো আর মলিনতা থেকে দূরে থাকো।" [আল মুদ্দাসসির ঃ ১-৫]

দ্বিতীয় অহীর এই আয়াত ক'টিতে গোপন ও প্রকাশ্য পবিত্রতার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সাথে বলা হয়েছে ঃ 'পরিধেয় পবিত্র রাখো' এবং 'মলিনতা থেকে দূরে থাকো।' শুধুমাত্র 'পরিধেয় পবিত্র রাখো' আয়াতটিই পবিত্রতার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত। কারণ পরিধেয় পবিত্র রাখার অর্থই হলো, সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও গোপন পবিত্রতা অবলম্বন করা এবং পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা।

www.bjilibrary.com

এই পরিপূর্ণ পবিত্রতা অবলম্বনের নির্দেশ থেকে প্রমাণ হয় ইসলাম কতোটা মহান, সুন্দর ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থা। এর বাইরের দিক এবং ভিতরের দিক সবটাই পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং অনাবিল।

কুরআন কি ধরনের পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেই তার গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ – (البقرة : ٢٢٢)

"যারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ অবশ্যি তাদের ভালবাসেন।" [আল বাকারা ঃ ২২২]

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ –

(البقرة : ٢٢٢)

"ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের নিকট গমন করোনা যতোক্ষণনা তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়।"

[আল বাকারা ঃ ২২২]

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ – (البقرة : ٢٢٢)

"অতপর তারা যখন পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদের নিকট গমন করো আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়।" [আল বাকারা ঃ ২২২]

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ –

(التوبه : ١٠٨)

"এখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসে আর আল্লাহও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।

[আততাওবা ঃ ১০৮]

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا – (المائده : ٦)

"আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে পবিত্র হয়ে নাও।"

[আল মায়িদা ঃ ৬]

فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۙ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۭ (الواقعه : ٧٨–٧٩)

www.bjilibrary.com

"তা এক সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত। পবিত্রতা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।" [আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৮–৭৯]

وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ – (البقرة : ٢٥)

"সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" [আল বাকারা ঃ ২৫]

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ – (ال عمران : ١٥)

"চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগী। আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা হবে তারা সৌভাগ্যমণ্ডিত।"

[আলে ইমরান ঃ ১৫]

পবিত্রতা সম্পর্কে এগুলো হলো কুরআনের বক্তব্য। ইসলামী দাওয়াত ও শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করীম (সা)–ও পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার প্রতি সীমাহীন গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

الطهور شطر الايمان – (مسلم)

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।" [মুসলিম]

لاتقبل الصلوة بلا طهور (مسلم)

"পবিত্রতা (অযু প্রভৃতি) ছাড়া নামায গ্রহণযোগ্য হয়না।" [মুসলিম]

কুরআন এবং হাদীসের এই বাণীগুলোর আলোকে পরিষ্কার হলো যে, পবিত্রতা একদিকে যেমন ঈমানের অংশ, অপরদিকে মুসলিম হবারও অন্যতম শর্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। জিব্রীল আমীন যখন রাসূল আল আমীন (সা)–কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'ইসলাম কি?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ

الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلوة وتوتى الزكوة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وان تتم الوضوء وتصوم رمضان ....الخ

www.bjilibrary.com

"ইসলাম হলো, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমকর্তা নেই। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করবে। যাকাত পরিশোধ করবে। বায়তুল্লায় হজ্জ করবে। উমরাহ করবে। অপবিত্রতা দূর করার জন্য গোসল করবে। অযু পূর্ণ করবে।" রমযানের রোযা রাখবে। জিব্রীল জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো করলে কি আমি মুসলিম হবো? তিনি জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। জিব্রীল বললেন ঃ আপনি সঠিক বলেছেন।"

ইবনে খুযাইমা তাঁর 'আসসহীহ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণনার সামান্য পার্থক্যসহ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নামাযের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত বানিয়ে দিয়েছেন। রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ

مامن مسلم يتطهر.فيتم الطهور الذى كتب الله عليه فيصلى هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارات لما بينها- (مسلم)

"যে ব্যক্তি পবিত্রতা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে অতপর এরূপ পবিত্রতা নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তার এই নামাযগুলো প্রতি দুই ওয়াক্ত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ।" [মুসলিম]

অপরদিকে গোসল আর অযুর জন্য যদি পানি পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে ইসলাম তায়াম্মুমকেই পবিত্রতার মাধ্যম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-

(النساء ٤٣ والمائده -٦)

"অতপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" [আন নিসা ঃ ৪৩, আল মায়িদা ঃ ৬]

www.bjilibrary.com

কুরআন ও হাদীসের এই বাণীগুলোর আলোকে ইসলামকে যদি পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ধর্ম বলা হয়, তবে তা ভুল হবেনা, বরং যথার্থই বলা হবে। রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ

الطهو رشطر الايمان والحمد لله تملاء الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاء مابين السموات والارض والصلوة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك او عليك - كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها -

(مسلم - كتاب الطهارة)

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদুলিল্লাহর সওয়াব মীযান পূর্ণ করে দেবে। সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহর সওয়াব আকাশমণ্ডল এবং যমীনের মধ্যবর্তী গোটা শূন্যতা পূর্ণ করে দেবে। নামায হলো জ্যোতি। সদকা হলো প্রমাণ। সবর হলো আলো। আর কুরআন হলো সাক্ষ্য তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে। প্রতিটি মানুষ প্রত্যুষে উঠে এবং নিজের জীবনের বেচাকেনা করে। অতপর সে হয়তো নিজেকে মুক্ত করে, নয়তো ধ্বংস করে।"

[মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়]

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে অযু করবার নির্দেশ দিয়েছেন। অতপর এ কাজের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره - (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি অযু করে। পূর্ণ নিয়ম নিষ্ঠার সাথে অযুকে পূর্ণ করে। তার দেহ থেকে তার সমস্ত পাপ পংকিলতা বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় তার নখের নিচে থেকে পর্যন্ত।" [বুখারী, মুসলিম]

তিনি (সা) আরো বলেছেন ঃ

انتم الغر المحجلون من اسباغ الوضوء - (متفق عليه)

www.bjilibrary.com

"অযুর পরিপূর্ণতার কারণে কিয়ামতের দিন তোমরা হস্ত ও মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতার অধিকারী হবে।" [বুখারী, মুসলিম]

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব আমলের কথা বলবনা, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেন? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যি বলুন। তিনি বললেন ঃ

اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة فذا لكم الرباط فذالكم الرباط (مسلم)

"সেগুলো হলো ঃ

১. কষ্ট এবং মন না চাওয়া অবস্থায়ও অযু পূর্ণ করা

২. মসজিদে যেতে অধিক অধিক পা ফেলা এবং

৩. এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এই হলো তোমাদের জন্য সত্যিকার রিবাত। এই-ই তোমাদের সত্যিকার রিবাত।"[১]

প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের নিকটই ইসলাম এই পবিত্রতা দাবী করে। পবিত্রতার যে দাবী ইসলাম পুরুষের নিকট করে, নারীর নিকটও সেই একই রকম দাবী করে।

উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলে করীমের (সা) নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল ঃ

ان الله لا يستحيى من الحق فهل على المراة من غسل اذا احتلمت ؟

"আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা করেন না, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে তাদের গোসল করা কি ওয়াজিব?" তিনি বললেন ঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরীদের ছাউনীকে 'রিবাত' বলা হয়, যা হলো শত্রুর হামলা থেকে সীমানাকে রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী।

www.bjilibrary.com

نعم اذا رات الماء

"হাঁ, অবশ্যি! বীর্যপাত হলে তাদের গোসল করতে হবে।" তাঁদের বক্তব্য শুনে উম্মুল মুমিনীন উম্মে হযরত সালামা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يا رسول الله اوتحتلم المراة ؟

"ওগো আল্লাহর রাসূল (সা) মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

تربت يداك – فبم يشبهها ولدها ؟

"তোমার হাতে ধূলো লাগুক! মেয়েদের স্বপ্নদোষ না হলে সন্তান মায়ের মতো হয় কেন?" [মুসলিম ঃ পবিত্রতা অধ্যায়]

কিছু কিছু অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ইসলাম গোসল ফরয করে দিয়েছে। যেমন স্ত্রী সহবাস, ঋতুস্রাব, নিফাস প্রভৃতি। এছাড়া নামাযের জন্য অযুও ফরয করে দেয়া হয়েছে।

সত্য কথা বলতে কি, ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি যেরূপ গুরুত্বারোপ করেছে, অনুরূপ গুরুত্ব অন্য কোন ধর্মে আরোপ করা হয়নি, বরঞ্চ ইসলাম পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার যে বিস্তৃত ধারণা দিয়েছে, অন্যান্য ধর্মতো তদ্রূপ কোনো ধারণাই পেশ করেনি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্যারিসে শত শত কক্ষ বিশিষ্ট একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটিও বাথরুম ছিলনা। অমুসলিমরা পবিত্রতা অর্জনের সেইসব উত্তম নিয়মনীতিও জানেনা, যা ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছে। যেমন, নামায পড়ার জন্য অযু করা এমন একটি সুন্দর পরিচ্ছন্নতা যা কেবল মুসলমানদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অন্যান্য জাতি তো স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তাও জানেনা। এমনকি পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার অভাবে তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ পর্যন্ত নির্গত হয়। বিভিন্ন ধরনের সেন্ট, স্নো, পাউডার প্রভৃতি ব্যবহার করে তারা এই দুর্গন্ধ চাপা দেবার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্যের মেয়েরা এভাবেই প্রলেপ লাগিয়ে নিজেদের দেহের দুর্গন্ধ চাপা দেয়। কিন্তু একজন মুমিন মহিলাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

www.bjilibrary.com

বিধান পালন করার কারণে নিজ দেহে কোনো প্রকার নোংরামীকে চাপা দেবার কসরত করতে হয়না। কারণ, তাকে এমনটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

اذا خرجت المراة الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة –

"কোনো নারী যখন মসজিদে যাবে, তখন সে যেনো শরীরে লাগানো সুগন্ধি দূর করার জন্য ঠিক সেভাবে গোসল করে, যেভাবে গোসল করে মিলনের অপবিত্রতা দূর করার জন্য।"

[নাসায়ী ঃ আবু হুরাইরা রা]

এ কারণেই ইসলামের ফকীহ্‌রা পবিত্রতার বিধানের প্রতি সীমাহীন গুরুত্বারোপ করেছেন। ফিকাহ্‌র গ্রন্থগুলোর প্রথম অধ্যায় রচনা করেছেন 'পবিত্রতা অধ্যায়'। আর পবিত্রতা অধ্যায়ের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মহিলাদের সংক্রান্ত বিধিবিধান।

আমরা এ পর্যায়ে কেবলমাত্র মহিলাদের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিধি বিধানই আলোচনা করবো। পুরুষ ও মহিলাদের পবিত্রতার যৌথ বিধি বিধান জানার জন্য অন্যান্য ফিকাহ গ্রন্থ পড়া যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

৩. দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাবের বর্ণনা

১. হযরত উম্মে কায়েস (রা) বিনতে মুহসিন বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি আমার একটি শিশু সন্তানকে (যে এখনো খাদ্যগ্রহণ আরম্ভ করেনি) নিয়ে নবী করীমের (সা) দরবারে গেলাম। বাচ্চাটি নবী করীমের (সা) কাপড়ে পেশাব করে দিলো। অতপর তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন এবং কাপড় ধুইলেন না। সিহাহ সিত্তার গ্রন্থগুলোতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের অপর একটি বর্ণনার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

فدعا بماء فرشه –

"অতপর তিনি পানি চেয়ে পাঠালেন এবং সেই কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিলেন।"

২. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل –

"দুগ্ধপায়ী শিশু যদি ছেলে হয়, তবে পানি ছিটিয়ে দিলেই তার পেশাব থেকে কাপড় পাক হবে। কিন্তু শিশু যদি মেয়ে হয় তাহলে তার পেশাব থেকে পবিত্র করার জন্য কাপড় ধুইয়ে নিতে হবে।"

[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

কাতাদা (র) বলেন, এই বিধান সেই সব বাচ্চাদের পেশাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা এখনো নিবিড় এবং পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করেনি। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ শুরু করার পর ছেলে হোক মেয়ে হোক উভয় ধরনের শিশুর পেশাব থেকেই কাপড় ধু'তে হবে। [আহমদ, তিরমিযী]

৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার 'মুখে অন্ন দেয়ার' জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একটি ছেলে শিশু আনা হয়। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয় এবং তিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দেন।' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে

www.bjilibrary.com

মাজাহ (র)। ইবনে মাজাহর বর্ণনায় এই অতিরিক্ত কথাটিও আছে ঃ 'এবং তা ধৌত করলেননা।'

৪. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীমের (সা) কাছে শিশুদের আনা হতো। তিনি তাদের 'মুখে অন্ন দিতেন' এবং তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন। একবার একটি শিশু আনা হলে সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি চেয়ে পাঠান। পানি আনা হলে তিনি তা কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন এবং কাপড় ধুইলেন না।

৫. নবী করীমের (সা) খাদিম আবুস সামাহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ মেয়ে শিশুর পেশাব ধুইতে হবে এবং ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। [আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

৬. হযরত উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী করীমের (সা) খেদমতে একটি ছেলে শিশু আনা হলে সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। তিনি যেখানে যেখানে পেশাব লেগেছে, সেখানে সেখানে পানি ছিটিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। আরেকবার তাঁর কাছে একটি কন্যা শিশু আনা হলে সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। এবার তিনি সেই কাপড়টি ধুইবার হুকুম দেন, যেটিতে সে পেশাব করে দিয়েছিল। [মুসনাদে আহমদ]

৭. হযরত উম্মে কুরয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেবে এবং মেয়ে শিশুর পেশাব ধুইয়ে নেবে। [ইবনে মাজাহ]

৮. হযরত উম্মুল ফদল লুবাবা বিনতে হারেছ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলীর (রা) শিশু পুত্র হুসাইন (রা) রাসূলে করীমের (সা) কোলে পেশাব করে দেয়। আমি আরয করলাম, ওগো রাসূলুল্লাহ (সা) কাপড়টি আমার কাছে দিন, আমি ধুইয়ে দিই। আপনি অন্য একটি কাপড় পরুন। তিনি বললেন ঃ

انما ينضح من بول الذكر ويغسل بول الانثى –

"ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলে। মেয়েরা পেশাব করলে ধুইতে হয়।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

www.bjilibrary.com

পেশাব নাজাস্

আভিধানিক অর্থে যে কোনো ময়লা, আবর্জনা, নোংরা ও নাপাক জিনিসকে 'নাজাস' বা 'নাজাসত' বলা হয়। এ হিসেবে মানুষের পেশাব পায়খানা নাজাস, চাই সে বয়স্ক হোক কিংবা দুগ্ধপায়ী শিশু হোক। একইভাবে মানুষের মযী,[১] অদী[২] এবং হাদীও[৩] নাজাসত।

নামাযীর শরীর, পোষাক এবং নামাযের স্থান সর্বপ্রকার নাজাসত থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অবশ্য সেসব নাজাসত ধর্তব্য নয় যেগুলো এ কারণে মাফ করে দেয়া হয়েছে যে, সেগুলো দূর করা কঠিন, কিংবা সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন ও দুষ্কর। অর্থাৎ সেসব নাজাসত যেগুলো দূর করা কিংবা যেগুলো থেকে মুক্ত হওয়া দুসাধ্য ও অসহনীয়। এর কারণ হলো আল্লাহ দীন ইসলামে এমন কিছু রাখেননি যা মানুষের অসাধ্য, অসহনীয়।

শিশু ছেলে এবং শিশু মেয়ের পেশাব সংক্রান্ত নবী আকরাম (সা)-এর হাদীসসমূহ আমরা একটু আগেই বর্ণনা করে এসেছি। এবার বিষয়টির উপর আরেকটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

হাদীসের نضح শব্দটির [যার অর্থ করেছি আমরা 'পানি ছিটিয়ে দেয়া] অর্থ সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। এই মতভেদ নিম্নরূপ ঃ

১. শেখ আবু মুহাম্মদ জুয়াইনী, কাযী হুসাইন এবং বগভীর (র) মতে نضح (নাদাহ) মানে পেশাব করা জিনিসে বেশী পরিমাণ পানি ঢেলে দেয়া, যেমনটি করা হয় সব ধরনের নাজাসতের ক্ষেত্রে। তবে পানির পরিমাণ এমন হবে যে, নিংড়াতে চাইলে নিংড়ানো যাবেনা।

২. কোনো কোনো আলিম উপরের মতটির সাথে দ্বিমত করে বলেছেন, নিংড়ানো আবশ্যক। তবে এ মতটি ঠিক নয়। কেননা এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নিংড়ানো শর্ত নয়।

---

১. 'মযী' হলো এক প্রকার লাসাযুক্ত রস যা যৌন কামনার সময় পুরুষের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়।

২. 'অদী' হলো সাদা লালা রস যা কখনো কখনো প্রস্রাবের পর পর নির্গত হয়।

৩. 'হাদী' হলো সেই সাদা পানি যা সন্তান প্রসবের পূর্বে মহিলাদের বিশেষ অঙ্গ দিয়ে নির্গত হয়।

www.bjilibrary.com

৩. ইমামুল হারামাইন ইমাম জুয়াইনী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে 'নাদাহ' মানে পেশাবের উপর পানি ছড়িয়ে দেয়া। এমন পরিমাণ পানি, যা ছড়িয়ে যাবেনা, বইয়ে পড়বেনা এবং ঝরে পড়বেনা। কিন্তু ছেলে শিশু ছাড়া অন্যদের পেশাবে বেশী পানি ঢেলে দেয়ার অর্থ ভিন্ন রকম। অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে অর্থ হলো, এতোটা পরিমাণ পানি হতে হবে, যাতে করে পানি ছড়িয়ে পড়ে, বইয়ে যায় এবং নাজাসতের স্থান থেকে ফোটা ফোটা টপকে পড়ে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নিংড়ানো শর্ত নয়। এ ব্যাপারে এটাই সঠিক মত। এ মতের উপরই আমল হয়ে আসছে। হযরত উম্মে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস এ মতেরই সমর্থক (দলীল)।[১]

তাহলে 'নাদাহ' মানে এই দাঁড়ালো যে, পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া, যেখানে যেখানে পেশাব লাগে সেখানে সেখানে পানি ছিটিয়ে দেয়া, যাতে করে তা ভিজে যায়, ছড়িয়ে না যায় এবং নিংড়ানো না যায়।

আলিমদের মধ্যে শিশুদের পেশাব সম্পর্কে তিনটি মত আছে ঃ

১. ছেলে শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে 'নাদাহ' যথেষ্ট। কিন্তু মেয়ে শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে 'নাদাহ' যথেষ্ট নয়, ধোয়া আবশ্যক। যেমনটি ধুইতে হয় অন্য সকল নাজাসতের ক্ষেত্রে। এটাই প্রসিদ্ধ মত, গৃহীত মত। হযরত আলী (রা), আতা, যুহরী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক এবং ইবনে ওহাব প্রমুখের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এটাই মত। এই মতই বর্ণিত হয়েছে ইমাম মালিক (র) থেকে। তবে তাঁর ছাত্ররা বলেছেন, এই বর্ণনাটির সূত্র বলিষ্ঠ নয়।

ইবনে হাযম লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা), সুফিয়ান সওরী, আওযায়ী, ইব্রাহীম নখয়ী, দাউদ যাহেরী (র)-ও এ মতেরই প্রবক্তা।

২. দ্বিতীয় মত হলো, ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশু উভয়ের পেশাবেই পানি ছিটিয়ে দেয়া যথেষ্ট। এটা ইমাম আওযায়ীর (র) মত। ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম শাফেয়ীরও একটি মত এরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. ইমাম নববীকৃত মুসলিমের শরাহ থেকে গৃহীত।

www.bjilibrary.com

৩. তৃতীয় মতটি হলো এই যে, ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের পেশাবই ধোয়া ওয়াজিব। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে এ মতটি যাদের, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) এবং কুফাবাসী আলেমগণ।

কিন্তু এই শেষোক্ত দু'টি মত বলিষ্ঠ নয়। এ প্রসংগে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এই দু'টি মতকে রহিত করে দেয়। হাদীস পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, ছেলে এবং মেয়ে শিশুর পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

এ প্রসংগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তাহলো এই যে, মতপার্থক্য শিশুর পেশাব নাজাসত কিনা সে ব্যাপারে নয়। বরঞ্চ যে জিনিসে শিশু পেশাব করে দেয় তা পবিত্র করার পদ্ধতি নিয়ে। পেশাব নাজাসত হবার ব্যাপারে কিন্তু কোনো মতভেদ নেই।

শিশু যতোদিন খাদ্য গ্রহণ শুরু না করে

আমরা উপরে হযরত উম্মে কায়েস (রা)-এর যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর শিশু সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাযির হন এবং শিশুটি তখনো খাদ্য গ্রহণ করেনি।" এই কথা বলে তিনি আসলে কি বুঝাতে চেয়েছেন? সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

"এই পানি ছিটিয়ে দেয়ার অনুমতি কেবল এমন বয়সের শিশুদের পেশাবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা এখনো নিবিড় খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করেনি। কিন্তু বাচ্চা যখন ঘন নিবিড় দানাদার খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন তার পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব। ধৌত করা ছাড়া তার নাজাসত দূর হয়না। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।

কিন্তু জন্মের পর পরই শিশুকে খেজুর প্রভৃতি দিয়ে যে 'মুখান্ন' দেয়া হয়, তার কারণে শিশুর পেশাব ধোয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়না বরং পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। 'নুকাতুত তানবীহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বুকের দুধ এবং মুখান্নের নির্দিষ্ট জিনিসটি ছাড়া যদি বাচ্চাকে আর কিছু না খাওয়ানো হয়, তবে শিশু ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।"

www.bjilibrary.com

শেখ জালালুদ্দীন মহল্লী 'মিনহাজুত তালেবীন' এর টীকায় লিখেছেন, মুখান্ন বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে খাওয়ানো গুড়ো বা গলানো ওষুধের দ্বারা ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়ার বিধানে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়না। অর্থাৎ এগুলো সত্ত্বেও পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট এবং ধৌত করা জরুরী নয়।

এর অর্থ এটাও যে, শিশুর রোগারোগ্যের জন্য যে মধু প্রভৃতি খাওয়ানো হয়, সেটা খাদ্যের সংজ্ঞায় পড়বেনা এবং সেটার কারণে 'নাদাহ'র বিধানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা।

আল মুফিকুল হামদী "শরহে তাম্বীহ্‌তে' লিখেছেন, হযরত উম্মে কায়েসের হাদীসের বক্তব্য হলো, তার বাচ্চাটি তখনো আলাদা খাদ্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করেনি (অর্থাৎ দুধ ছাড়েনি)। সুতরাং বুঝা গেলো, ছেলে শিশু যতো দিন বুকের দুধ ছেড়ে আলাদা ঘন খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু না করে এবং তার আহারের বেশীর ভাগ ঘন নিবিড় খাদ্য না হয়, ততোদিন তার পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান এটাই। অর্থাৎ পানি ছিটিয়ে দেয়া।

ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে অবকাশের কারণ

ছেলেদের পেশাবের ক্ষেত্রে শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে বলে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তার পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ এই হতে পারে যে, যেহেতু লোকেরা ছেলে শিশুদেরকে বেশী বেশী কোলে নেয়, ফলে ওদের পেশাবই কাপড়ে বেশী বেশী লেগে থাকে। প্রত্যেক বারই কাপড় ধৌত করা স্বাভাবিকভাবেই একটা কঠিন কাজ। তাই শরীয়ত এ ক্ষেত্রে তার বিধানকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছে।

আরেকটি কারণ এইও হতে পারে যে, ছেলেদের পেশাব এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। অপরদিকে মেয়েদের পেশাব একই স্থানে পড়ে।

তাছাড়া মেয়েদের পেশাবের তুলনায় ছেলেদের পেশাব অধিকতর হালকা পাতলা হয়। ফলে মেয়েদের পেশাবের মতো ছেলেদের পেশাব কাপড়ে একেবারে এঁটে যায়না।

www.bjilibrary.com

এছাড়া মেয়েদের পেশাব ছেলেদের পেশাবের তুলনায় অধিক নোংরা ওদুর্গন্ধযুক্ত।[১]

যে মা দুধ পান করায় তার জন্য বিশেষ বিধান

ফকীহগণ মনে করেন (যাদের মধ্যে মালেকী ফকীহ্‌রাও রয়েছেন) যে, স্তন্যদানকারী মহিলার কাপড়ে এবং শরীরে স্তন্যপায়ী শিশুর যে পেশাব পায়খানা লেগে যায়, তা এমন নাজাসত, যা ক্ষমা পাওয়া যাবে। শিশুটি তার নিজের সন্তান হোক কিংবা অপরের তাতে কিছু যায় আসেনা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, শিশুর পেশাব পায়খানা যেন তার কাপড়ে এবং শরীরে না লাগে এ ব্যাপারে তার মধ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে। অবশ্য এসব ফকীহদের মতে, উত্তম হলো সামর্থ থাকলে মহিলারা যেন পাল্টিয়ে পরার জন্য আলাদা এক জোড়া কাপড় রাখে।[২] এই একই হুকুম প্রযোজ্য সেই রক্তের ক্ষেত্রে যা কাপড় কাঁচার সময় উড়ে এসে পরিধানে পড়ে এবং সেই রক্তের ক্ষেত্রে যা ক্ষতস্থান চিকিৎসার সময় ডাক্তারের কাপড়ে লেগে যায়। অবশ্য নামাযের সময় এই লোকদের জন্য এসব কাপড় পাল্টিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরাই মুস্তাহাব।

এই বিধানগুলো নির্ণয় করা হয়েছে শরীয়তের সেই সাধারণ মূলনীতি থেকে, যাতে বলা হয়েছে সেসব শরয়ী বিধানকে সহজ করে দিতে হবে, যেগুলোর উপর আমল করা কষ্টসাধ্য। ইসলামী শরীয়ত যেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহ্‌দের উপর এমন কোনো হুকুম অপরিহার্য করে দেননা, যা পালন করা তাদের সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ বলেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز-(البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা বিধান করতে চান, তোমাদেরকে কঠোরতার মধ্যে নিমজ্জিত করতে চাননা। [আল বাকারা ঃ ১৮৫]

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط-(الحج : ٧٨)

---

১. আল্লামা ইবনুল কায়্যেম ঃ ইলামুল মুকেয়ীন, ২য় খণ্ড ৮৮ পৃঃ।

২. আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' (চার মাযহাবের ফিকাহ), দারুশ শিয়াব সংস্করণ, ২১ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ তোমাদের উপর দীন পালনের বিষয়টিকে সংকীর্ণ আঁটসাট বেঁধে দেননি।" [আল হজ্জ ঃ ৭৮]

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

بعثت بالحنيفية السمحة – (مسند احمد)

"আমাকে এমন একটি দীন নিয়ে পাঠানো হয়েছে যা অত্যন্ত সহজ সরল।" [মুসনাদে আহমদ]

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ

"যখন কোনো বিষয়ে কষ্ট ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে, তখন তাকে সহজ করে দিতে হবে।"

এই অবকাশ স্তন্যদানকারী মহিলার জন্য। স্তন্যপানকারী শিশুটি তার নিজের সন্তান হোক কিংবা না হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। এই সহজতা বিধান করা হয়েছে এই জন্য, যেহেতু তাকে স্তন্যপায়ী শিশুটিকে বার বার কোলে তুলে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুটি ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক তাতেও কোনো বাধা বন্ধন নেই। উভয় ধরনের শিশুর ক্ষেত্রেই শরীয়ত এই সহজতা দান করেছে।

www.bjilibrary.com

৪. রক্তের নাজাসাত এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

১. হযরত "আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আল্লাহর রাসূলের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ওগো আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাদের মেয়েদের কাপড়ে ঋতুর (হায়েয) রক্ত লেগে যায়। এমতাবস্থায় আমরা কি করবো (কিভাবে কাপড় পবিত্র করবো)?' তিনি বললেন ঃ প্রথমে ঘসে তুলে ফেলবে। তারপর পানি ঢেলে মধে ধুইয়ে নেবে। অতপর তা দিয়ে নামায পড়বে।" [বুখারী, মুসলিম]

২. হযরত "আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল (সা) আমার একটিই মাত্র পরনের কাপড় আছে। মাসিক চলাকালেও সেটাই পরি। (এমতাবস্থায় আমি কিভাবে নামায পড়বো)? তিনি বললেন ঃ "তুমি যখন ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন কাপড়ের যে স্থানে রক্ত লেগেছে, সে জায়গাটি ধুইয়ে নাও এবং তাই দিয়ে নামায পড়ো।" খাওলা পুনরায় নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! রক্তের দাগ তো যায়না। তিনি বললেন ঃ পানি দিয়ে ধুইয়ে ফেলাই যথেষ্ট। রক্তের দাগ থাকলে কোনো ক্ষতি নেই।"

৩. মুআযা (রা) বলেন ঃ আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েদের কাপড়ে যদি ঋতুর রক্ত লাগে, তখন সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ "রক্ত ধুইয়ে ফেলবে, দাগ না গেলে তার উপর হলদে রঙের কিছু দিয়ে রঙ পরিবর্তন করে দেবে।" তিনি আরো বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময় আমার মাসিক হতো। লাগাতার তিনটি মাসিক পর্যন্ত আমি একই কাপড় পরতাম এবং কাপড়টি ধুইতে পারতামনা।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ]

হাদীসগুলো থেকে কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার হলো। বুঝা গেলো, রক্ত নাজাসত। এ ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। বুঝা গেলো,

www.bjilibrary.com

নাজাসত পানি দিয়ে ধুইতে হবে। ধোয়া ওয়াজিব। তবে ধোয়ার ব্যাপারে এমন কোনো শর্ত নেই যে, দু'বার ধুইতে হবে, বা তিনবার ধুইতে হবে। বরঞ্চ পরিষ্কার করে নেয়াটাই যথেষ্ট, এতে একবার ধুইতে হোক কিংবা একাধিকবার, তাতে কিছু যায় আসেনা।

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ মনে রাখা দরকার, নাজাসত দূর করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ওয়াজিব, তাহলো পরিষ্কার করা। নাজাসত যদি হুকমী[১] হয় তবে একবার ধোয়া ওয়াজিব। একাধিকবার ধোয়া ওয়াজিব নয়। তবে দু'বার বা তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا - (مسلم)

"যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন নিজের হাত ভরা-পাত্রে না ডুবায়, যতোক্ষণ না সে হাত পরিষ্কার করে ধুইয়ে নেবে তিনবার।[২]" [মুসলিম]

কিন্তু নাজাসত যদি দেখা যায় (যেমন রক্ত প্রভৃতি), তবে তার সার নির্যাস পর্যন্ত পরিষ্কার করা জরুরী। সার নির্যাস পরিষ্কার করার পর দু'বার বা তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব। নাজাসতের সারাংশ ধোয়ার পরও যদি রং বাকী থাকে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ পবিত্রতা তো পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু নাজাসতের স্বাদ বা সারাংশ যদি কিছু বাকী থাকে, তবে কাপড় পূর্বের মতোই অপবিত্র থেকে যাবে। পরিষ্কার করার পর যদি গন্ধ বাকী থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর দুইটি মত পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশুদ্ধ মতটি হলো, (গন্ধ বাকী থাকলেও) কাপড় পাক হয়ে যাবে।

মাসিকের রক্ত এমন একটি নাজাসত যা বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকলেও কাপড় পাক হবেনা। অথচ নামাযের অন্যতম শর্ত হলো কাপড় বা পোষাক পাক হওয়া।

---

১. নাজাসতে হুকমী সেই নাজাসতকে বলা হয় যা চোখে দেখা যায় না। যেমন পেশাব।

২. এখানে তিনবারের দু'টি অর্থ হতে পারে ১. 'তিনবার ধুইয়ে নেবে' কিংবা ২. 'ধুইয়ে নেবে' কথাটি রাসূল (সা) তিনবার বলেছেন। -অনুবাদক

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী ঃ 'পানি দিয়ে ধুইয়ে ফেললেই যথেষ্ট। রক্তের দাগ থাকলে কোনো ক্ষতি নেই।'—এ কথারই প্রমাণ যে, নাজাসত ধুইতে হবে পাক পানি দিয়ে। সিরকা জাতীয় তরল বস্তু দিয়ে ধোয়া যথেষ্ট নয়। কেননা ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে পানি দিয়ে। এই হাদীসে এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, নাজাসত ধুইবার পর তার যদি এমন কোনো দাগ থেকে যায়, যা দূর করা কষ্টকর তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে এই ক্ষেত্রে সেই দাগকে জাফরান বা অন্য কোনো হলুদ রং দিয়ে মুছে বা পরিবর্তন করে দেয়া উচিত যাতে করে রক্তের রং পরিলক্ষিত না হয়। কারণ তাতে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অপর কেউ সেই দাগ দেখলে মনে করতে পারে যে, ধোয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়ে গেছে। যে জিনিস প্রকৃতিগত দিক থেকে পবিত্র, তা ততোক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রই থাকে, যতক্ষণ তাতে নাজাসত না লাগে। আর যখনই তাতে নাজাসত লেগে যাবে, তখনই ধোয়া জরুরী। তৃতীয় হাদীসটিতে হযরত আয়েশা বলেছেন, 'আমি ধুইতাম না'। তাতে বুঝা যায় যে, তিনি সম্ভবত খুবই সতর্ক থাকতেন এবং তাঁর কাপড়ে রক্ত লাগতো না। কিংবা পুরো কাপড় ধুইতেন না, নির্দিষ্ট স্থান ধুইতেন।

www.bjilibrary.com

পুরুষ কর্তৃক নারীকে স্পর্শ করা এবং মুসাফাহা করা

অযু অবস্থায় পুরুষের নারীকে স্পর্শ করার বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী আলিমগণের মতে নারী পুরুষ যৌন উন্মত্ততার সাথে অনাবৃত দেহে (সংগম না করে) পরস্পরকে আলিংগন না করা পর্যন্ত শুধু স্পর্শ করলে অযু ভংগ হবেনা।

মালিকীদের মতে অযু ভংগ হবার জন্য চারটি শর্ত বর্তমান থাকতে হবে ঃ

১. স্পর্শকারী বালিগ হতে হবে।

২. এই স্পর্শ সুখ আস্বাদনের জন্য হতে হবে, কিংবা সংগমের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু সুখ ভোগের জন্য হতে হবে।

৩. শরীরের যে অংশ স্পর্শ করা হবে তা অনাবৃত হতে হবে। আবৃত থাকলেও খুব পাতলা কাপড় হতে হবে। মোটা কাপড় হলে অযু ভাংবে না। তবে সে অবস্থায় ভাংবে, যদি দেহের স্পর্শ করা অংশ ধরে টানাটানি করা হয় এবং স্বাদ আস্বাদন করা উদ্দেশ্য হয়, কিংবা স্বাদ ভোগ করা হয়ে থাকে।

৪. যাকে স্পর্শ করা হবে, তাকে এমন নারী হতে হবে, যার প্রতি স্বাভাবিকভাবে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমন ধরনের ছোট মেয়েকে স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গবে না, যার প্রতি যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়না। যেমন পাঁচ বছরের কিশোরী কিংবা এমন বৃদ্ধা যাকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই কোনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়না।

এসব শর্ত পাওয়া গেলে এমন কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলেই অযু ভেঙ্গে যাবে, যে জন্মগতভাবে মাহরাম নয়, চাই সে স্ত্রী হোক কিংবা

www.bjilibrary.com

অন্য কোনো নারী। তবে স্পর্শ অবশ্যি উপরে বর্ণিত ধরনের হতে হবে। নতুবা অযু ভাংবে না।

এতক্ষণ যাবত স্পর্শকারীর অযু সম্পর্কে আলোচিত হলো। কিন্তু যাকে স্পর্শ করা হয়, তার অযুর কি হবে? তার ব্যাপারে মাসআলা হলো, সে যদি বালেগা হয় এবং স্পর্শ করলে যদি সুখ অনুভব করে, তবে তারও অযু ভেংগে যাবে। তারও যদি সুখ ভোগের উদ্দেশ্য থাকে, তবে তার ব্যাপারেও সেই বিধান, যে বিধান স্পর্শকারীর জন্য। এমতাবস্থায় তার ক্ষেত্রেও ঐ সকল হুকুম প্রযোজ্য হবে, যা স্পর্শকারীর ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে।

অবশ্য স্পর্শ না করে কেবল তাকালে এবং চিন্তা করলে অযু ভাংবে না, এ ক্ষেত্রে সুখ অনুভবের নিয়্যত থাকুক কিংবা সুখ অনুভব করে থাকুক, তাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু এই দেখা এবং চিন্তা করার সময় যদি মযী[১] নির্গত হয় তবে অযু ভেংগে যাবে। আর যদি বীর্য নির্গত হয়, তবে গোসল করা অপরিহার্য।

শাফেয়ীদের মতে কোনো পরনারীকে স্পর্শ করলে অযু ভেংগে যাবে। এমনকি এ স্পর্শ দ্বারা যদি সুখানুভব নাও হয়, স্পর্শকারী যদি বৃদ্ধও হয় এবং যাকে স্পর্শ করা হবে সে যদি বিশ্রী বৃদ্ধাও হয়, তবুও অযু ভেংগে যাবে। এ স্পর্শের মাঝখানে অর্থাৎ স্পর্শকারীর হাত এবং যাকে স্পর্শ করা হবে তার দেহের মাঝখানে যদি কাপড় চোপড় বা অন্য কিছু প্রতিবন্ধক হয় তবে অযু ভাংবে না। এমনকি এ প্রতিবন্ধক কাপড়টি যদি হালকা পাতলাও হয়, তবু ভাংবে না। এমনকি অন্য কোনো আস্তরণ হলেও নয়।

অবশ্য শাফেয়ী আলিমগণের মতে চুল, দাঁত এবং নখ স্পর্শ করলে অযু ভাংবে না। এমনকি এতে সুখানুভব করলেও নয়। কারণ, এগুলো এমন অংগ যেগুলো স্পর্শ করলে সাধারণত সুখানুভব হয়না।

মৃত নারী স্পর্শ করলেও অযু ভেংগে যাবে। তবে সে নারী যদি মহরাম হয়, এমন মহরাম যাকে বিয়ে করা চিরতরে নিষিদ্ধ, তবে অযু ভাংবে না। এই বিয়ে হারামের ব্যাপারটা রক্ত সম্পর্কের কারণে হোক,

১. কামোত্তেজনার সময় বীর্য নির্গত হবার পূর্বে যে আঠালো রস নির্গত হয়, সেটাই মযী।

www.bjilibrary.com

দুগ্ধ পানের কারণে হোক কিংবা জামাই হবার কারণে হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু যেসব মহিলাকে চিরতরের জন্য বিয়ে করা হারাম নয়, তাদের কারো মৃত দেহ স্পর্শ করলে অযু ভেংগে যায়। যেমন স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু এবং স্ত্রীর খালা।

হাম্বলী আলিমগণের মতে, পরনারী হোক, মহরাম মহিলা হোক, জীবিত হোক কিংবা মৃত হোক, যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা হোক, বড় হোক কিংবা ছোট হোক তাদের দেখে যদি সাধারণত মনের মধ্যে কামনার ভাব সৃষ্টি হয়, তবে এমন যে কোনো নারীকে কামনার সাথে স্পর্শের মাঝখানে কাপড় চোপড়ের কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্পর্শ করলে অযু ভেংগে যাবে।

এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ নারীও যদি পুরুষকে উপরে বর্ণিত ধরনের স্পর্শ করে, তবে তারও অযু ভেংগে যাবে। তবে স্পর্শ করা অংগ চুল, দাঁত এবং নখ ছাড়া অন্য কোনো অংগ হতে হবে। চুল, দাঁত এবং নখ স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হবেনা।

মালিকীদের মতে যাকে স্পর্শ করা হবে, তার অযু নষ্ট হবে না, এমনকি সে সুখ ও স্বাদ অনুভব করলেও।

উপরে যেসব মত বর্ণিত হলো, তার প্রত্যেকটির সপক্ষেই কোনো না কোনো দলীল প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। প্রতিটি মতই সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ অনুবর্তনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা থেকে আমরা একটি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, পরনারীকে স্পর্শ না করা ও মুসাফাহা না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহামহিম আল্লাহ নেক ও সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন।

অযু অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা

উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা করা হয়েছে পরনারী সম্পর্কে। কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারটা কি হবে? স্ত্রী তো পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। অযু অবস্থায় তাকে স্পর্শ করা যাবে কি? ঐ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

www.bjilibrary.com

যেমন পুরুষ যদি অযু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মুসাফাহা করে কিংবা তার গায়ে হাত লাগায় তবে কি তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী এবং আবু দাউদ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কাউকেও কাউকেও চুমু খেতেন, অতপর আর অযু না করেই নামাযে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেনঃ রাসূলে করীম (সা) রাত্রে নামায পড়ার সময় আমি শুয়ে থাকতাম। আমার পা তাঁর সিজদার জায়গায় চলে যেতো। তিনি সিজদায় যাবার কালে আমার পায়ে টোকা দিতেন। তখন আমি পা সরিয়ে নিতাম।" [বুখারী, মুসলিম]

তাছাড়া ইসহাক ইবনে রাহওয়ায় এবং বাযযায মজবুত সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রোযা থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে চুমু খেয়েছেন এবং বলেছেন, চুমুতে অযুও নষ্ট হয়না, রোযাও নষ্ট হয়না।

মুসলিম এবং তিরমিযী আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনা সূত্রকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এক রাত্রে আমি (ঘুম থেকে জেগে) দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা) বিছানায় নেই। আমি তাঁকে খুঁজতে বেরুলাম। গিয়ে দেখি তিনি মসজিদে উপুড় হয়ে সিজদায় পড়ে আছেন। তাঁর দু' পা উপরে উঠে আছে। তাঁর দু'পায়ের তালুতে আমি দু'হাত রেখে দিলাম। তিনি দোআ করছিলেন ঃ

اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذبك منك لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার দয়া ও ক্ষমার আশ্রয় চাই। তোমার (পাকড়াও) থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার মহিমা ও গুণাবলী আমি গুণে শেষ করতে পারবনা। তুমি ঠিক তেমন, যেসব গুণাবলীতে তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছো।"

www.bjilibrary.com

এ যাবত যে হাদীসগুলো উল্লেখ করা গেলো, সেগুলো থেকে প্রমাণ হয়, অযু অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হবেনা। কিন্তু দু'একটি বিপরীত ধরনের হাদীসও আছে। যেমন ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) অকাট্যভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু দিলো, কিংবা হাতে স্পর্শ করলো, তার জন্য অযু অপরিহার্য। (হাদীসটি ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

২. বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, "চুমু শৃংগার পর্যায়ের স্পর্শ, অবশ্য সহবাস নয়, তার চাইতে কম। সুতরাং চুমু খেলে অযু করা ওয়াজিব।[১]

১. নায়লুল আওতার, ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ।

www.bjilibrary.com

৬. নখ পালিশ

নখে যদি এমন কোনো রং লাগানো হয়, যার নিবিড় স্তর জমেনা (যেমন মেহেন্দী), তবে তাতে অযু বা গোসলের ক্ষতি হয়না। এই রং যদি নখে লেগেও থাকে, কিছু দিন যদি স্থায়ীও হয়, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এতে নামাযের ক্ষতি হবেনা।

কিন্তু যদি এমন রং লাগানো হয়, যার নিবিড়ভাবে স্তর জমে যায়, এঁটে যায় (যেমন মেডোরা, সুইস মিস ইত্যাদি কেমিক্যাল নেইল পালিশ), তবে অযু বা গোসলের আগে লাগালে নখে এগুলোর বর্তমানে অযূ গোসল বিশুদ্ধ হবেনা। অযু বা গোসলের পরে লাগালে নামাযের ক্ষতি হবেনা। এগুলো যখনই লাগানো হোকনা কেন, অযু গোসলের সময় যদি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং নখ ও চামড়ায় যদি সঠিকভাবে পানি পৌছায়, তবে অযু, গোসল ও নামাযের কোনো ক্ষতি হবেনা।

এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে যে, যে পালিশের বর্তমানে অযু গোসল বিশুদ্ধ হয়না, তাহলো এমন পালিশ, যা গাঢ় এবং নিবিড়। নখে পালিশ থাকা অবস্থায় অযু-গোসল বিশুদ্ধ হয় বলে যেসব মিশরী আলিম ফতোয়া দিয়েছেন, তাদের সে ফতোয়া নির্ঘাত ভ্রান্ত ফতোয়া। কেননা, এ ক্ষেত্রে এমন কোনো শরীয়ত সম্মত ওযর বর্তমান নেই, যেটাকে অযু-গোসল বিশুদ্ধ হবার জন্য বৈধ কারণ বানানো যেতে পারে। মিশর দারুল ইফতার পরিচালক বিজ্ঞ শাইখ হাসনাইন মুহাম্মদ মাখলূফ-এরও এটাই মত যে, নেইল পলিশের বর্তমানে অযু গোসল বিশুদ্ধ হয়না। শাইখুল আযহার ডক্টর আবদুল হালীম মাহমুদও কায়রো রেডিওর 'কুরআনুল করীম প্রোগ্রাম' থেকে প্রচারিত তাঁর রায়ে এ মতই প্রকাশ করেছেন।

দেখুন ফতোয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম খণ্ড পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় এই মাসআলাটি উল্লেখ হয়েছে যে, কারো নখ যদি উল্টে যায় এবং সে যদি

www.bjilibrary.com

তার উপর ওষুধের প্রলেপ লাগিয়ে রাখে আর এই প্রলেপ উঠানো ক্ষতিকারক হয়, তবে সে অযু-গোসলের সময় লেপের উপর দিয়ে মাসেহ করে নেবে আর মাসেহ করাটাও যদি ক্ষতির কারণ হয় তবে মাসেহ না করলেও চলবে। একইভাবে কারো পায়ের আংগুল যদি জখম হয় এবং সে যদি তাতে পট্টি বা মলম লাগিয়ে রাখে এবং এই পট্টি বা মলম যদি জখমের স্থানের চাইতে কিছু বেশী জায়গা জুড়েও লাগানো হয় তবে অযু-গোসলের সময় তার উপর মাসেহ করে ফেললেই অযু-গোসল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, পট্টি বা লেপনের স্থান পূর্ণটা মাসেহ করতে হবে। এসব অবস্থায় কেবল 'ওযর' বা 'প্রয়োজন'-এর কারণেই মাসেহ করাকে বৈধ বলা হয়েছে। কিন্তু নখ পালিশের ক্ষেত্রে তো এ ধরনের কোনো 'ওযর' বা 'প্রয়োজন' বর্তমান নাই, যা বৈধ হবার দাবী পূরণ করতে পারে। সুতরাং অযু-গোসলের সময় নেইল পলিশ উঠিয়ে ফেলা আবশ্যক। নতুবা অযু-গোসল বিশুদ্ধ হবেনা।

এ প্রসংগে আমি আমার বোন ও কন্যাদের একটি কথা বলা জরুরী মনে করছি। তাহলো, নেইল পলিশ ব্যবহারের এই কু অভ্যাস থেকে আপনারা নিজেদেরকে রক্ষা করুন। এই কু ফ্যাসনটি আমাদের দেশে চালু হয়েছে পাশ্চাত্যের লাগামহীন সংস্কৃতির অবাধ আমদানীর ফলে। এই তথাকথিত সংস্কৃতি কোনো প্রকার নিয়ম-শৃংখলা মানতে রাজী নয়। এর দাবীই হলো অবাধ মেলামেশা। সুতরাং এই ফ্যাসন কিছুতেই নারীকে সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে পারেনা। ইসলাম নারীদেরকে সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদানের যে মহান দৃষ্টিভংগি রাখে এই তথাকথিত সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের মধ্যে সেই রকম কোনো কল্যাণের চিন্তাই নেই।

আমাদের বোন ও মেয়েদের জন্য সত্যিকার সম্মানজনক পথ এটাই যে, তারা পশ্চিমা খোদাদ্রোহী ও অশ্লীল মহিলাদের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করবে এবং নবী করীমের পবিত্র সম্মানিত স্ত্রী ও কন্যাদের এবং মুহাজির ও আনসার মহিলাদের পদাংক অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

এই নেইল পলিশের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কোনো সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস নেই। তাছাড়া, যে মেয়েরা নেইল পলিশ ব্যবহার করে তারা নিজেদের নখকে লম্বা করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাদের এ কথা মনে

www.bjilibrary.com

থাকেনা যে, নখ লম্বা করা সুস্থ মানব স্বভাবের বিপরীত কাজ। আল্লাহর নবী (সা) এ ব্যাপারে আমাদেরকে পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি নিয়মিত নখ কাটার হুকুম দিয়েছেন। লম্বা নখের অপকারিতা অনেক। এটা অস্বাস্থ্যকরও বটে।

তাই মুসলিম মহিলাদের কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা। তাদের উচিত দীনী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা। দীনের বিধিবিধান মেনে চলা। ধ্যান ধারণা এবং আমল উভয় দিক থেকে নিজেকে পূর্ণ মুসলিম বানানো। তাদের উচিত, নোংরা সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসরণ না করা। অশ্লীলতার দিকে আকর্ষণ করে এমন যে কোনো কাজ পরিহার করা।

www.bjilibrary.com

৭. পরচুলা বা কৃত্রিম চুল লাগানো

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لعن الله الواصلة والمستوصلة – (متفق عليه)

"ঐ নারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুলা লাগায়। ঐ নারীর প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুলা প্রস্তুত করে।"

[বুখারী, মুসলিম

এ যুগের জনৈক আলিম ফতোয়া দিয়েছেন, পরচুলা বা কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করা মহিলাদের জন্য বৈধ।

সত্যি এই মুফতী সাহেব আশ্চর্য এবং দুর্লভ ফতোয়া দানে বড় পটু। মুফতী সাহেবকে আমরা অনুরোধ করছি, আপনি আপনার এই ভ্রান্ত ফতোয়া রহিত করুন এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধানের দিকে ফিরে আসুন।

শরীয়তের বিধান

১. জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার একটি মেয়ের বসন্ত উঠেছিল। এতে ওর চুল ঝরে পড়ে গেছে। এখন সে বধূ হতে যাচ্ছে। আমি কি তার মাথায় পরচুলা জুড়ে দেবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যে নিজে পরচুলা লাগায় এবং যে তা লাগিয়ে দেয় তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। [বুখারী, মুসলিম]

২. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলেন ঃ আমি যে বছর হজ্জ করেছি, সে বছরই হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) মিম্বরে ভাষণ দিতে দেখেছি। তিনি তাঁর একজন রক্ষীর হাত থেকে এক গোছা পরচুলা হাতে নিয়ে বললেন ঃ হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমরা কোথায়? আমি নবী করীম (সা)–কে এসব জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করতে

www.bjilibrary.com

শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা (সাজ সজ্জার জন্য) এ ধরনের জিনিস ব্যবহার করা শুরু করে। [বুখারী, মুসলিম]

৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। সেই সব নারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিজ শরীরে উল্কি এঁকে নেয় এবং যারা উল্কি এঁকে দেয়। ঐসব নারীর প্রতিও যারা নিজের ভ্রু উৎপাটন করায় এবং যারা তা করে দেয়। সেই সব নারীর প্রতিও অভিশাপ বর্ষিত হয় যারা স্বীয় দাঁত ঘর্ষণ করে সরু করা এবং দুই দাঁতের মাঝখানে ফাঁক বৃদ্ধি করার জন্যে)। অভিশাপ এমন সকল নারীর প্রতি যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব ইবনে মাসউদের (রা) এই বক্তব্য শুনতে পেয়ে সোজা তাঁর বাড়ীতে চলে আসেন। এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ "আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এরূপ এরূপ নারীকে অভিশাপ দিচ্ছেন?" ইবনে মাসউদ বললেন ঃ "কেন আমি তাদেরকে অভিশাপ দেবনা? যাদেরকে স্বয়ং নবী করীম (সা) অভিশাপ দিয়েছেন এবং যাদেরকে কুরআন নিন্দা করেছে?" মহিলা বললেন ঃ "আমি গোটা কুরআন পড়েছি। কিন্তু এমন কথাতো কোনো স্থানে পাইনি?" ইবনে মাসউদ (রা) জবাব দেন ঃ "তুমি যদি সত্যি কুরআন পড়ে থাকো, তবে নিশ্চয়ই তা পেয়ে থাকবে। কেন তুমি কি এই আয়াতটি পড়নি?"

ان استطعت ان لايراها احد فلا يرينها –

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তাই গ্রহণ করো। আর সে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।"

মহিলা বললো ঃ আয়াতটি অবশ্যি পড়েছি। ইবনে মাসউদ বললেন ঃ "রাসূল এগুলো করতে নিষেধ করেছেন।" মহিলাটি বললো ঃ "আমি এখনই আপনার স্ত্রীকে দেখবো, আমার মনে হয় তিনিও এগুলো করেন।" তিনি বললেন ঃ "যাও, ভিতরে গিয়ে দেখো (সে এগুলো করেনা)" মহিলাটি ভিতরে গেলো। গিয়ে সে এরূপ কিছুই দেখতে পায়নি। অতএব সে ফিরে এসে বললো ঃ 'না, এমন কিছু দেখতে

www.bjilibrary.com

পেলাম না।' ইবনে মাসউদ (রা) বললেন ঃ "তুমি যা মনে করছিলে, সেরূপ হলে আমি তার সাথে থাকতাম না।"

[বুখারী, মুসলিম]

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সব মহিলাকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পরচুলা ব্যবহার করে এবং যারা তা প্রস্তুত করে। ঐসব নারীকেও তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নিজ শরীরে উল্কি আঁকায় এবং যারা তা এঁকে দেয়। [বুখারী, মুসলিম]

৫. আরেকটি বর্ণনা আছে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন ঃ তোমরা অত্যন্ত মন্দ আকৃতি ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছো। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) 'যূর' (অন্যকে প্রতারিত করার জন্য বিশেষ ধরনের আকৃতি গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করেছেন।

কাতাদাহ (র) বলেছেন ঃ হযরত মুয়াবিয়ার (রা) এই 'যূর' কথাটির অর্থ হলো সেই সব কৃত্রিম চুল বা পরচুলা যা মেয়েরা নিজেদের চুলকে বড় বা অধিক দেখাবার জন্যে ব্যবহার করে থাকে।

কাতাদাহ বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি লাঠির মাথায় করে কৃত্রিম চেহারা বেঁধে এনেছিল। তাই দেখেই মুয়াবিয়া (রা) বলেছিলেন ঃ এটাই 'যূর'। [বুখারী, মুসলিম]

উপরোল্লেখিত দলীল-প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে উম্মতের আলিমগণ নারীদের নিজ চুলের সাথে কৃত্রিম চুল সংযোজন করাকে হারাম বলেছেন। পরচুলা প্রভৃতি ব্যবহার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ তা হারাম।

ফকীহদের মতামত

মহিলাদের জন্য পরচুলা লাগানো জায়েয নাকি জায়েয নয়, তাছাড়া নাজায়েয হলে তাকি কঠোরভাবে নিষেধ নাকি হালকাভাবে? এ ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে।

(১) হানাফী ফকীহদের মত হলো, নারীদের জন্য পরচুলা (অপর কোনো মানুষের চুল) লাগানো অকাট্যভাবে হারাম, চাই সে চুল তার

www.bjilibrary.com

নিজের চুল হোক, স্বামীর চুল হোক, কোনো মাহরাম ব্যক্তির চুল হোক অপর কোনো নারীর চুল হোক কিংবা হোক অন্য কোনো ধরনের মানব চুল।

কিন্তু নিজ চুলে মানুষের ছাড়া অন্যদের চুল বা পশম লাগানো জায়েয। যেমন ছাগল বা ভেড়ার পশম কিংবা অন্য কোনো কৃত্রিম চুল। এগুলো এ জন্য জায়েয, কেননা, এগুলোতে কোনো প্রতারণা নাই এবং অপর কোনো মানবাংগের ব্যবহার নাই।

হানাফীদের মতে এ দুটিই পরচুলা নাজায়েয হবার কারণ।[১]

(২) মালেকীদের মতে, যে কোনো ধরনের পরচুলাই নাজায়েয। চাই সেটা মানুষের চুল হোক, পশম হোক কিংবা হোক অন্য কোনো ধরনের চুল। শাফেয়ী মাযহাবের সেরা ইমামদের অন্যতম ইমাম নববীও এই মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি তাঁর 'আল মজমূ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"যারা পরচুলাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলেছেন, তাদের মতই সর্বাধিক শক্তিশালী। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহ থেকে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।"[২]

(৩) শাফেয়ীদের মতে মানব চুলের পরচুলা লাগানো সম্পূর্ণ হারাম। এ মত হানাফীদের মতেরই অনুরূপ। অবশ্য মানব চুল ছাড়া অন্য কিছুর (যেমন পশম ইত্যাদি) পরচুলা লাগানোর দুটি অবস্থা হতে পারে ঃ

ক. যে জিনিসের পরচুলা লাগানো হবে, তা যদি হারাম হয়, তবে সে পরচুলা লাগানো হারাম। কেননা, নামাযে এমনকি নামায ছাড়াও না পাক জিনিস ব্যবহার করা হারাম।

খ. কিন্তু যে জিনিস দিয়ে পরচুলা বানানো হয়েছে, তা যদি পাক হয়, তবে তা কোন্ ধরনের মহিলা ব্যবহার করছে, তা দেখতে হবে। যদি তার স্বামী না থাকে, তবে তার জন্য তা লাগানো হারাম। আর তার যদি স্বামী থাকে, তবে তার সম্পর্কে তিনটি মত আছে ঃ

ক. একটি মত হলো, কেবলমাত্র স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষেই তার জন্য এরূপ পরচুলা লাগানো বৈধ।

---

১. রাদ্দুল মুহতার ইবনে আবেদীন (শামী) ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ঃ ৩৭২-৩৭৩।
২. 'আলমজমূ' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭

www.bjilibrary.com

খ. দ্বিতীয় মত হলো, এরূপ পরচুলা লাগানো সম্পূর্ণ বৈধ, সুতরাং তাতে স্বামীর অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই।

গ. তৃতীয় মত হলো, স্বামীর অনুমতি পেলেও পরচুলা লাগানো হারাম।

ইমাম নববী তাঁর আল মজমু' গ্রন্থে লিখেছেন, শাফেয়ীদের কাছে প্রথম মতটিই সবচাইতে বিশুদ্ধ।[১]

(৪) হাম্বলীদের মতেও মানব চুলের পরচুলা লাগানো বা ব্যবহার করা হারাম। কেননা, এমনটি করা এক ধরনের প্রতারণা। তাদের মতে মানুষের চুল নয়, এমন জিনিসের পরচুলা লাগানোও হারাম। যেমন, পশম প্রভৃতি। অবশ্য চুল বাঁধার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চুলে জোড়া লাগানোর ব্যাপারে বিধান হলো, যদি তা কেবল চুল বাঁধার কাপড় হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই, কারণ, তা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বস্ত্রখণ্ড যদি তার চাইতে বেশী পরিমাণের হয়, তবে সে ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বর্ণনা মতে তা ব্যবহার করা মাকরূহ।[২]

আলোচনার সারকথা

এ যাবত যা কিছু আলোচনা করা হলো, তা থেকে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তা হলো, চারটি বড় মযহাব এ ব্যাপারে একমত যে, মানব চুলের পরচুলা লাগানো বা ব্যবহার করা হারাম; চাই সে পরচুলা কোনো মাহরামের হোক, স্বামীর হোক, পরপুরুষের হোক, অপর কোনো নারীর হোক, কিংবা হোক তা নিজ চুলের তৈরী। এ রায় থেকে বুঝা গেলো ঃ

১. মানব চুল দ্বারা যে বিভিন্ন রকম পরচুলা তৈরী করা হয়, তা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম।

২. এমন কোনো জিনিসের তৈরী পরচুলা ব্যবহার করাও হারাম, যা দেখতে স্বাভাবিক মানব চুলের মতোই দেখায়, যা দেখে দর্শক নারীর আসল চুল ভেবে প্রতারিত হয়। যেমন আজকাল নায়লন প্রভৃতি দ্বারা যেসব পরচুলা তৈরী করা হয় সেগুলো।

---

১. আল মজমু ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭
২. আল মুগনী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯

www.bjilibrary.com

হারাম হবার এই রায়টি কিয়াস দ্বারা ফায়সালা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু মানব চুলের পরচুলা লাগানো হারাম হবার কারণ হলো, দর্শক প্রতারিত হওয়া, তাই সেই একই কারণে ঐসব কৃত্রিম চুলও হারাম যেগুলো দেখে দর্শক প্রতারিত হয়। এরূপ কিয়াসের দলীল মওজুদ রয়েছে উপরে উল্লেখিত হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে। তাছাড়া তার আগে উল্লেখিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) (আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করা সংক্রান্ত) হাদীস থেকেও এরূপ কিয়াসের দলীল পাওয়া যায়। কারণ বর্তমান থাকলে (অর্থাৎ যে কারণে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন, সে কারণ বর্তমান থাকলে) কোনো জিনিস হারাম হয়ে যায় বলে ফকীহগণ একমত।

৩. এমন কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা মুবাহ,[১] যা আসল চুলের মতো নয় এবং দর্শকও প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারবেন যে, তা সত্যিকার চুল নয় এবং মহিলাটির নিজের চুলও নয়। বরং তা তার নিজের চুলের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম, যেমন পশম, সূতা প্রভৃতি। এরূপ কৃত্রিম চুলের ব্যবহার মুবাহ হবার কারণ হলো, এগুলোতে সেই কারণ (অর্থাৎ ধোঁকা) বর্তমান নেই যা একটু আগে বলা হয়েছে। কিন্তু মুবাহ হওয়া সত্ত্বেও এগুলো ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো থেকে সাধারণভাবেই পরচুলা বা কৃত্রিম চুল ব্যবহারের বিপক্ষে মত পাওয়া যায়। আবুয যোবায়ের জাবির (রা)–এর সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবুয যোবায়ের বলেন, আমি জাবির (রা)–কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদেরকে নিজেদের চুলের সাথে কোনো জিনিসের জোড়া লাগাতে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম]

এ যাবত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলো মালিকী ও হাম্বলী মযহাবের ইমামগণের দৃষ্টিভংগি। কিন্তু আমরা মানব চুল নয় এমন কৃত্রিম চুল লাগানোকে হারাম বলতে পারিনা। কেননা, হাদীস থেকে পরচুলা হারাম হবার যে কারণ জানা যায় তা এ ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান নেই। এহলো হানাফী মাযহাবের মত।

১. মুবাহ মানে যা ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই।–অনুবাদক

www.bjilibrary.com

৪. এমন রংগীন সূতা বা ফিতা দিয়ে চুল বাঁধা সম্পূর্ণ জায়েয, যা দেখার সাথে সাথে বুঝা যায় যে, তা মহিলাদের নিজেদের চুল নয়। এটা এ জন্য জায়েয যে, এটা জোড়া লাগানোর আওতায় পড়েনা। এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার না করাই উত্তম। এ হচ্ছে হাম্বলী ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি।

মেইকআপ, আকৃতি পরিবর্তন এবং মুখমণ্ডল রঙ্গিন করা

এ যাবত যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা ছিলো উয়িগ বা পরচুলা সম্পর্কে। উপরে যে হাদীসগুলো আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলোর ভিত্তিতে আরো কতিপয় বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজনবোধ করছি। হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, মহিলাদের জন্য এমন সকল সাজসজ্জা হারাম কিংবা মাকরূহ, যদ্বারা তার সেই প্রকৃত সূরত ও আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়, যে সূরত ও আকৃতিতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং দর্শক সেটাকে তার প্রকৃত সূরত ও আকৃতি মনে করে প্রতারিত হয়। যেমন, চোখের পাতা ও ভ্রুর চুল ছেঁটে বা চেঁছে ফেলা কিংবা মুখমন্ডলের মধ্যে এমন সব রংগিন (পাউডার, পালিশ ইত্যাদি) জিনিস লাগানো, যা দেখে দর্শক মনে করবে এ রং মহিলাটির নিজস্ব সৃষ্টিগত রং। এ বিষয়টি নিয়ে শাফেয়ী মযহাবের আলিমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা ইমাম নববী তাঁর আলমাজমু' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

'আত তাহযীব' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, মুখমণ্ডলে লাল রং লাগানো, চুলে কালো খেযাব দেয়া এবং আংগুলকে বিভিন্ন ফ্যাশনে সজ্জিত করা স্বামীর অনুমতি ছাড়া হারাম। আবার স্বামীর অনুমতির ক্ষেত্রেও দু'টি মত রয়েছে। এর মধ্যে বিশুদ্ধ মতটি হলো, স্বামী অনুমতি দিলেও এগুলো হারাম।

এছাড়া মহিলাদের জন্য এ জাতীয় সাজসজ্জা করা জায়েয, যেগুলোতে ধোঁকা প্রতারণা নেই। এগুলো সেই সব মহিলাদের জন্যও জায়েয যাদের স্বামী নেই, কিন্তু শর্ত হলো, পরপুরুষকে দেখানোর জন্য

www.bjilibrary.com

সাজসজ্জা করা যাবেনা। তবে এরূপ মহিলাদের জন্য বেশী সাজসজ্জা না করাই উত্তম।

যে মহিলার স্বামী আছে এবং স্বামী যদি সাজসজ্জা করবার দাবী করে, তবে স্বামীর জন্য সে মহিলার সাজসজ্জা করা ওয়াজিব। কেননা, স্ত্রীর সাজ সৌন্দর্য দেখার অধিকার স্বামীর রয়েছে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে সাজগোজ করতে নিষেধ করে, তবে সে মহিলার জন্য সাজসজ্জা করা হারাম। কেননা, এ অবস্থায় সাজসজ্জা করা স্বামীর আনুগত্য পরিহার করার শামিল। আর স্বামী যদি স্ত্রীর সাজগোজ দাবী না করে এবং সাজগোজ করতে নিষেধও না করে, তবে এমতাবস্থায় সাজগোজ করা একজন মহিলার জন্য সেই রকমই মুবাহ, যেরকম মুবাহ ঐ মহিলার জন্য, যার স্বামী নাই।

এতোক্ষণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো, তার আলোকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাথায় পরচুলা বা কৃত্রিম চুল লাগানো, সেই ধরনের সাজসজ্জা যা হারাম বা কবীরা গুনাহ। এটা এমন কাজ যাকে তুচ্ছ বা নগণ্য মনে করে উপেক্ষা করা যেতে পারেনা। এ ধরনের কাজের ক্ষতি অনুধাবন করার জন্য হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বর্ণিত হাদীসটির উল্লেখই যথেষ্ট। তাতে বলা হয়েছে ঃ "বনী ইসরাঈল কেবল এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের নারীরাও এ ধরনের কৃত্রিম চুল বা পরচুলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।"

হযরত মুয়াবিয়া (রা) এ সম্পর্কে আরো মন্তব্য করেছিলেন যে, "আমার ধারণা এ ধরনের কাজ ইহুদীরা ছাড়া অন্য কেউ করেনা।" সুতরাং বিজ্ঞজনের উচিত শিক্ষা গ্রহণ করা।

কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করার বিধান

এ যাবত যা আলোচনা করা গেলো, তা হলো পরচুলা বা কৃত্রিম চুল সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ার বিধান। অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে এরূপ চুল ব্যবহার করা বৈধ নয়। সুতরাং উয়িগ, পরচুলা বা কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করলেই চলবে, মাথা মাসেহ করার প্রয়োজন নেই, কি করে এমন কথা বলা যেতে পারে? আল্লাহ তাআলা তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ঃ

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ—(المائدة : ٦)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে, তখন নিজেদের মুখ মণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথায় হাত ঘুরাবে আর গোড়ালী পর্যন্ত পা ধুইয়ে নেবে।" [মায়িদা : ৬]

আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশের আলোকে অযুর ফরয বা রুকন চারটি :

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া।

৩. মাথা মাসেহ করা।

৪. দুই পা গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া।

সুতরাং অযুতে মাথা মাসেহ করা ফরয এবং এটা অযুর চারটি রুকনের একটি। তাই মাথা মাসেহ করা ছাড়া অযু পূর্ণ হতে পারে না। মাথা মাসেহ করা যে ফরয এ ব্যাপারে ইসলামের সমস্ত আলিম একমত। তবে মাথার কতটুকু অংশ মাসেহ করলে এই ফরযটি আদায় হবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

● ইমাম মালিকের (রা) মতে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো সাথীর মতে এক-তৃতীয়াংশ মাসেহ করা যথেষ্ট। আবার কেউ কেউ মনে করেন দুই-তৃতীয়াংশ মাসেহ করা জরুরী।

● হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয।

● শাফেয়ীদের মতে মাথার কিছু অংশ মাসেহ করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে, সেই অংশটুকু যতোই কম হোকনা কেন।

● হাম্বলী মযহাবে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয।

এই মতামতসমূহের উদ্ধৃতি থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাথা মাসেহ করা সর্বসম্মতভাবে ফরয। তবে মতভেদ আছে কেবল

www.bjilibrary.com

এই ক্ষেত্রে যে, কতটুকু মাথা মাসেহ করা ফরয? এই মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার ভিত্তি হলো আয়াতের "বিরুউসিকুম" শব্দের এই 'বি' অর্থাৎ 'বা' অক্ষরটি। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি 'হরফে জার'। এটি কখনো বাক্যের মধ্যে একটি অতিরিক্ত অক্ষর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন এর কোনো অর্থ গ্রহণ করা হয়না। আবার কখনো এটি ব্যবহৃত হয় 'কিছু অংশ' বুঝানোর জন্য। যেমন কেউ যদি বলে, اخذت بثوبه يا بعضده। তখন এর অর্থ 'আমি তার কাপড় বা বাহুর কিছু অংশ ধরেছি।' এর দ্বারা পুরো কাপড় বা পুরো বাহু ধরা বুঝায় না। ইমামদের কেউ কেউ এই 'বা' অক্ষরকে অতিরিক্ত অর্থাৎ অর্থহীন ধরে নিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে ইমাম মুসলিম বর্ণিত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার (রা) এই হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি হলো ঃ "নবী করীম (সা) অযু করলেন এবং তাঁর কপাল ও পাগড়ী মাসেহ করলেন। অর্থাৎ পাগড়ীকে কিছুটা উপরে উঠালেন এবং মাথার কপাল ও পাগড়ী মাসেহ করলেন।"

এ হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, পরচুলা বা কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করলে অযু শুদ্ধ হতে পারেনা, যতোক্ষণ না মাথার কিছু অংশ অন্তত মাসেহ করা হবে। আর এমতাবস্থায় কেবল সেই সব আলিমগণের মতের উপরই আমল হবে যাঁরা মনে করেন মাথার কিছু অংশ মাসেহ করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ্য, শাইখুল আযহার ডক্টর আবদুল হালীম মাহমুদ (র) ফতোয়া দিয়েছেন যে, পরচুলা বা কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করলে অযু শুদ্ধ হয়না। তাঁর এই ফতওয়া কায়রো রেডিওর 'কুরআন প্রচার' প্রোগ্রাম থেকে প্রচারিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৮. মোজা বা পদাবরণীর উপর মাসেহ করা

কিছু কিছু মহিলা কর্মচারী তাদের অফিস টাইমে এবং কিছু কিছু ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকা অবস্থায় মোজা খুলে অযু করার কাজকে জটিল ও দুষ্কর অনুভব করছেন। তারা প্রশ্ন করেছেন, মহিলারা অযূর সময় পা ধুইবার পরিবর্তে মোজার উপর মাসেহ করে নিলে অযু শুদ্ধ হবে কি?

তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে বলছি, নবী করীম (সা)'র সুন্নাত মুবারক থেকে মোজার উপর মাসেহ করার কথা প্রমাণিত আছে। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) মোজার উপর মাসেহ করেছেন। হাদীসটি বুখারীতে উল্লেখ আছে।

মোজা বা পদাবরণীর উপর মাসেহ করার এই অবকাশ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য। এ অবকাশ ভ্রমণকালেও প্রযোজ্য এবং মুকীম অবস্থায়ও প্রযোজ্য। মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে কিছু শর্ত আছে যা নিম্নে আলোচিত হলো। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, পা ধোয়াটাই উত্তম আর মোজার উপর মাসেহ করাটা অবকাশ মাত্র, যা পা ধোয়ার বিধানটিকে সহজসাধ্য করার জন্যই বৈধ করা হয়েছে।

মোজার উপর মাসেহ শুদ্ধ হবার জন্য যেসব শর্ত পূর্ণ হওয়া জরুরী, তার মধ্যে একটি হলো এই যে, সে মোজা এমন হতে হবে যা পরে অনবরত চলাফেরা করা যায়, যা পায়ের সাথে আঁটসাঁট লেগে থাকে, চলাফেরার সময় যে মোজা থেকে পা বেরিয়ে পড়ে না বা যে মোজা স্বতই খুলে যায়না। এই মাসআলাটির ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে নিম্নরূপ মতভেদ রয়েছে ঃ

১. মালিকী মযহাবের মতে মোজা চামড়ার তৈরী না হলে তার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়। শুধু চামড়ার তৈরী হলেই চলবেনা, বরং তা

www.bjilibrary.com

সেলাই করে তৈরী করা হতে হবে, চামড়ার টুকরাকে সিরিশ প্রভৃতি আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তৈরী করা হলে মাসেহ বিশুদ্ধ হবেনা।

২. শাফেয়ীদের মতে কেবল এমন মোজার উপরই মাসেহ করা জায়েয, যা চামড়া বা মজবুত পশমের তৈরী।

৩. হানাফীদের মতে এমন মজবুত মোজার উপরই মাসেহ করা জায়েয, যা পরে এক ফরসখ (প্রায় তিন মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করা যেতে পারে। এতোটা টেকসই ও মজবুতী স্বয়ং মোজার মধ্যেই থাকতে হবে, তার উপর চামড়ার জুতা পরে মজবুতী প্রমাণ করলে চলবেনা। মোজা যদি এতোটা মজবুত না হয় তবে তার উপর মোসেহ করা দুরস্ত হবেনা। তাছাড়া মোজা যদি খুব পাতলা হয়, কিংবা লোহা বা সীসা অথবা অনুরূপ কোনো জিনিসের তৈরী হয়, তবে তার উপর মাসেহ বিশুদ্ধ হবে না।

৪. হাম্বলীদের মতে মোজার উপর মাসেহ শুদ্ধ হবার জন্য শর্ত হলো, মোজা এমন হতে হবে, যা পরে এতোটা পথ অতিক্রম করা যায়, যতোটা পথ অতিক্রম করলে সেটাকে সাধারণত হেঁটে আসা বলা হয়। সে মোজা এমন জিনিসের তৈরী হলেও চলবে, যা দিয়ে সাধারণত মোজা তৈরী করা হয়না। যেমন ঃ লোহা, কাঠ প্রভৃতি।

'আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ' (চার মযহাবের ফিক্‌হ) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (সা) মোজার উপর মাসেহ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী করীম (সা) মোজা এবং জুতার উপর মাসেহ করেছেন।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী]

এছাড়া মোজার উপর মাসেহ বৈধ হবার কথা নবী করীমের (সা) নয় জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা গেলো ঃ হযরত আলী, আম্মার ইবনে ইয়াসার, ইবনে মাসউদ, আনাস, ইবনে উমর, বারা' ইবনে আযেব, বিলাল, ইবনে আবী আওফা এবং সহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মোজার উপর মাসেহ শুদ্ধ হবার জন্য মোজা মোটা হওয়াও একটি শর্ত। সুতরাং এমন পাতলা মোজার উপর মাসেহ করা দুরস্ত নেই,

www.bjilibrary.com

যেগুলো বেঁধে রাখা ছাড়া পায়ে এঁটে থাকেনা। এমন পাতলা মোজার উপরও মাসেহ শুদ্ধ হয়না, যেগুলোর ভেতর পানি ঢুকে গিয়ে পায়ের চামড়ায় লাগতে পারে। এমন স্বচ্ছ মোজার উপরও মাসেহ দুরস্ত হয়না, যেগুলোর ভেতর পা দেখা যায়, চাই সে মোজা মোটা হোক কিংবা পাতলা।

এছাড়া মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে আরো কি কি শর্ত আছে এবং কি পরিমাণ জায়গা মাসেহ করা জরুরী, সে সব বিস্তারিত বিষয় জানার জন্য অন্যান্য ফিক্‌হের গ্রন্থাবলী দেখা যেতে পারে।

[একালের সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে স্কটল্যাণ্ডে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করেছিলেন এবং তিনি এর যে জবাব দিয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গে সেই প্রশ্নোত্তরটি উদ্ধৃত করে দেয়া জরুরী মনে করছি। –অনুবাদক]

"প্রশ্ন ঃ মোজা বা পদাবরণীর ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। আমি বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কটল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে অবস্থান করছি। শীতকালে এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সব সময় পশমী পদাবরণী ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ধরনের পদাবরণীর ওপর মাসেহ করা যায় কি? মেহেরবানী করে আহকামে ইসলামের দৃষ্টিতে আপনার গবেষণা জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

জবাব ঃ চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয। এ ব্যাপারে প্রায় সকল আহলে সুন্নাত একমত। কিন্তু সূতা ও উলের মোজা সম্পর্কে আমাদের ফকীহগণ সাধারণত এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা মোটা হতে হবে এবং এমন পাতলা যেন না হয় যার তলদেশ দিয়ে পায়ের চামড়া নজরে আসে এবং কোনো প্রকার বন্ধন ছাড়া নিজেই পায়ের সাথে জড়িয়ে থাকে।

শর্তগুলোর উৎস অনুসন্ধানে আমি আমার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু হাদীসে এমন কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয় তা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজা ও জুতার ওপর মাসেহ করেছেন। নাসায়ী ছাড়া

www.bjilibrary.com

সুনান গ্রন্থসমূহ ও মুসনাদে আহমদে মুগীরা ইবনে শু'বার রিওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে নবী (সা) অযু করেছেন এবং مَسَحَ عَلَى الجوربين والنعلين ... ... মোজা ও জুতার ওপর মাসেহ করেছেন। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), বারাআ ইবনে আযিব (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), আবু উমামাহ (রা), সহল ইবনে সা'দ (রা) এবং আমর ইবনে হারিস (রা) প্রমুখ মোজার ওপর মাসেহ করেছেন। অধিকন্তু হযরত উমর (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ কাজের বর্ণনা আছে। বরং বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রা) ও আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এবং তাহাবী আউস ইবনে আবু আউস থেকে এ বর্ণনাও করেছেন যে, হুযুর (সা) শুধুমাত্র জুতার ওপরই মাসেহ করেছেন। এতে মোজার উল্লেখ নেই। আর এমন কাজ হযরত আলীও (রা) করেছেন বলে উল্লেখ আছে। উপরোল্লিখিত বিভিন্ন রিওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায়, শুধুমাত্র জুতা এবং মোজা পরিহিত জুতার ওপর মাসেহ করাও তেমনিভাবে জায়েয, যেমন চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। এসব রিওয়ায়েতের কোথাও রাসূল (সা) ফকীহ্‌দের আলোচ্য শর্তাবলীর কোনো শর্তের কথা বর্ণনা করেননি। কোনো জায়গায় একথারও উল্লেখ পাওয়া যায়না যে, যেসব মোজার ওপর রাসূল (সা) এবং উপরোল্লিখিত সাহাবাগণ (রা) মাসেহ করেছিলেন, সেগুলো কোন্ ধরনের ছিল। এ কারণে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ফকীহ্‌দের আরোপিত শর্তাবলীর কোনো ভিত্তি নেই। ফকীহ্‌গণ যেহেতু শরীয়তের প্রবর্তক নন, সেহেতু তাঁদের আরোপিত শর্ত যদি না মানা হয়, তাহলে গুনাহ হতে পারেনা।

ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম আহমদের (র) রায় হলো, মানুষ এমন অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করতে পারে, যখন উপরে জুতা পরিধান করে। কিন্তু উপরে যেসব সাহাবার আছারের কথা বলা হয়েছে তাঁদের কেউ এ শর্ত মেনে চলেননি।

মোজার ওপর মাসেহ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে আমি যা কিছু বুঝেছি, তা হলো প্রকৃতপক্ষে এটা তায়াম্মুমের মতোই একটি অবকাশ। যখন কোনো মুমিন বান্দা তার পা ঢেকে রাখতে বাধ্য হয় অথবা বার বার পা ধোয়া তার জন্য ক্ষতিকর কিংবা কষ্টকর হয়, তখন

www.bjilibrary.com

তাকে এ সহজ পন্থা অবলম্বনের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এই সুবিধার ভিত্তি এই অনুমানের ওপর নয় যে, অযুর পর মোজা পরিধান করলে পা অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে, সুতরাং পা ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকবেনা। বরং এর ভিত্তি হলো আল্লাহর রহমত, যা বান্দাকে অবকাশ প্রদানের প্রয়াসী। কাজেই এমন প্রত্যেক বস্তু যা শীত থেকে অথবা রাস্তার ধূলাবালি থেকে বাঁচার জন্য কিংবা কোনো ক্ষতের হিফাজতের জন্য মানুষ পরিধান করে থাকে এবং যা বারবার খোলা এবং পুনঃ পুনঃ পরিধান করা কষ্টকর, তার উপর মাসেহ করা যায়। সেটা পশমের পদাবরণী হোক কিংবা সূতার, চামড়ার জুতা হোক কিংবা ক্রিমছের, অথবা কোনো কাপড়ই হোকনা কেন, যা পায়ের সাথে লেপটে বাঁধা হয়েছে। তাতে কিছু যায় আসেনা।

আমি যখন কাউকে অযুর পর মাসেহ করার জন্য হাতকে পায়ের দিকে বাড়াতে দেখি, তখন আমার মনে হয় যেন এই বান্দা আপন রবকে বলছেন ঃ "আদেশ দিলে এক্ষণি মোজা খুলে পা ধুয়ে নেব। কিন্তু যেহেতু আপনিই অবকাশ দিয়েছেন, তাই মাসেহ্ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।" আমার মতে মোজা ইত্যাদির ওপর মাসেহ করার তাৎপর্যের এটাই প্রকৃত প্রাণসত্তা। আর এই প্রাণসত্তার দিক দিয়ে ঐ সমস্ত জিনিস সমান, যেগুলো ঐসব প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ পরিধান করে থাকে, যেগুলোর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাসেহ করার অবকাশ দেয়া হয়েছে।"[১]

১. তরজুমানুল কুরআন ঃ জুন-জুলাই সংখ্যা-১৯৫২ ইং, রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড ঃ কিস্তি মাসায়েল অধ্যায়।

www.bjilibrary.com

৯. বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (الواقعه : ٧٩)

"ওটাকে পবিত্ররা ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারেনা।"

[আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৯]

আমরা এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো, তাহলো অযু ছাড়া কুরআন মজীদ স্পর্শ করার ব্যাপারে বিধান কি?

এ বিষয়ে যদিও বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু জমহুর আহলি সুন্নাতের মাসলক হলো, অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ।

তাঁদের দলীল হলো ইমাম মালিক বর্ণিত সেই হাদীসটি, যাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) আমর ইবনে হাযমকে কিছু লিখিত বাণী প্রদান করেছিলেন, তাতে এ কথাটিও লিপিবদ্ধ ছিলো যে, কুরআনকে কেবলমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করবে।

এই লিখিত বাণীটি উম্মতের আলিমগণ পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এতে কেউ কোনো আপত্তি উত্থাপন করেননি। হাদীসটি আবু উবায়দা ফাদায়িলুল কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য লোকেরাও হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আছরামও (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাফেযে মাগরিব ইমাম ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, এই হাদীসটি মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদা রাখে। কেননা, লোকেরা এটিকে এক হাত থেকে আরেক হাতে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি দারুণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান লিখেছেনঃ আমি এই লেখাটির চাইতে বিশুদ্ধতম কোনো লেখা দেখিনি। কেননা, নবী করীমের (সা) সাহাবী ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীগণ একে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং এর মোকাবিলায় নিজেদের মত ত্যাগ করেছেন। হাকিম

www.bjilibrary.com

(রা) লিখেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এবং ইমাম যুহ্‌রী (র) এ লেখাটিকে সহীহ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا تمس القران الا وانت طاهر –

"পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করোনা।"

এ মাসআলায় ইমাম দাউদ যাহেরী ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে অযুহীন অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। তাঁর দলীল হলো রোম সম্রাট কাইজারের নিকট প্রেরিত নবী করীম (সা)–এর চিঠি, যাতে কুরআনের আয়াত লেখা ছিলো। অর্থাৎ কাইজার অমুসলিম ছিলেন এবং তার অযু ও পবিত্র অবস্থায় থাকার প্রশ্নই উঠেনা।

এর জবাবে জমহুর আলিমগণ বলেছেন গোটা কুরআন মজীদ এবং চিঠির মধ্যকার একটি আয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে।

[আল্লামা মওদূদী (র) তাঁর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআনে' প্রথমে উল্লেখিত "পবিত্ররা ছাড়া ওটাকে আর কেউ স্পর্শ করতে পারেনা" আয়াতটির ব্যাখ্যায় এ প্রসংগে এক দীর্ঘ ফিক্‌হী আলোচনা করেছেন। এখানে সেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনাটি উদ্ধৃত করে দেয়া খুবই উপকারী হবে বলে মনে করছি। –অনুবাদক]

তাফহীমুল কুরআনের বর্ণনা

"মুফাসসিরদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের 'লা ইয়ামাস্‌সুহু'–এর 'লা' শব্দটিকে 'না' অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আয়াতের অর্থ করেছেন "পাক পবিত্র নয়, এমন কোনো ব্যক্তি যেনো তা স্পর্শ না করে।" কিংবা "এমন কোনো ব্যক্তির তা স্পর্শ করা উচিত নয়, যে নাপাক।" আরো কতিপয় মুফাসসির যদিও 'লা' শব্দটিকে 'না' অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ করেছেন—এই গ্রন্থ পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে 'না' শব্দটি ঠিক তেমনি নির্দেশ সূচক যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী اَلْمُسْلِمُ اَخُوْلاَيَظْلِمُهُ মুসলমান মুসলমানের ভাই।

www.bjilibrary.com

সে তার ওপর যুলুম করে না)–এর মধ্যে উল্লেখিত 'না' শব্দটি নির্দেশ সূচক। এখানে যদিও বর্ণনামূলকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমান মুসলমানের ওপর যুলুম করেনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মুসলমান মুসলমানের উপর যুলুম করবেনা। অনুরূপ এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, পবিত্ররা ছাড়া কুরআনকে কেউ স্পর্শ করেনা। কিন্তু তা থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি তা স্পর্শ করবেনা।

তবে প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাখ্যা আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে খাপ খায়না। পূর্বাপর বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করেই কেবল এ বাক্যের এরূপ অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু যে বর্ণনা ধারার মধ্যে কথাটি বলা হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে রেখে একে বিচার করলে একথা বলার আর কোনো সুযোগই থাকেনা যে, পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ যেন এ গ্রন্থ স্পর্শ না করে। কারণ এখানে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ কাফেরদেরকে। তাদের বলা হচ্ছে, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, শয়তানরা নবীকে তা শিখিয়ে দেয়। "কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা ছাড়া এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবেনা" শরীয়তের এই নির্দেশটি এখানে বর্ণনা করার কি যুক্তি ও অবকাশ থাকতে পারে? বড় জোর যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যদিও আয়াতটি নাযিল হয়নি, কিন্তু বাক্যের ভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর দরবারে যেমন কেবল পবিত্ররাই এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে, অনুরূপ দুনিয়াতেও অন্তত সেই সব ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় এ গ্রন্থ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে যারা এ গ্রন্থটি আল্লাহর বাণী হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) ইমাম মালিক (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম বর্ণিত এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের নেতৃবৃন্দের কাছে আমর ইবনে হাযমের মাধ্যমে যে লিখিত নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন

www.bjilibrary.com

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেনো কুরআন স্পর্শ না করে," আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে ইমাম যুহ্‌রী থেকে একথাটি উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আবু মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের লিখিত যে নির্দেশনামা দেখেছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিলো।

(২) হযরত আলী (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন ঃ "গোসল ফরয হওয়ার অপবিত্র অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারতোনা।" [আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী]।

(৩) ইবনে 'উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঋতুবতী নারী এবং গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি যেনো কুরআনের কোনো অংশ না পড়ে।" [আবু দাউদ, তিরমিযী]

(৪) বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিও লিখিত ছিলো يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... ...

সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেয়ীগণ থেকে এ মাসয়ালাটি সম্পর্কে যেসব মতামত বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত সালমান ফারসী (রা) অযু ছাড়া কুরআন শরীফ পড়া দোষণীয় মনে করতেননা। তবে তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। হযরত সা'দ ইবনে (রা) আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-ও এ মত অনুসরণ করতেন। হযরত হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীও বিনা অযুতে কুরআন শরীফ সম্পর্শ করা মাকরূহ মনে করতেন। (আহকামুল কুরআন ঃ জাস্‌সাস)। আতা, তাউস, শা'বী এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে [আল-মুগনী ঃ ইবনে কুদামাহ]। তবে তাঁদের সবার মতে অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে পড়া কিংবা মুখস্ত পড়া জায়েয।

www.bjilibrary.com

নাপাক, হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হাসান বসরী, হযরত ইবরাহীম নাখয়ী এবং ইমাম যুহরীর মতে মাকরূহ। তবে ইবনে আব্বাস (রা)-এর মত ছিলো এই যে কোন ব্যক্তি কুরআনের যে অংশ স্বভাবতই মুখে মুখে পড়তে অভ্যস্ত তা মুখস্ত পড়তে পারে। তিনি এ মতের উপর আমলও করতেন। এ মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন ঃ তার স্মৃতিতে কি কুরআন সংরক্ষিত নেই? সুতরাং পড়ায় কি দোষ হতে পারে? [আল মুগনী ও আলমুহাল্লা ঃ ইবনে হাযম]

এ মাসয়ালা সম্পর্কে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ ঃ ইমাম আলাউদ্দিন আল কাশানী 'বাদায়ীউস্ সনায়ে' গ্রন্থে এ বিষয়ে হানাফীদের মতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "বিনা অযুতে নামায পড়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি কুরআন মজীদ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তবে কুরআন মজীদ যদি গেলাফের মধ্যে থাকে তাহলে স্পর্শ করা যেতে পারে। কোনো কোনো ফকীহর মতে চামড়ার আবরণ এবং কারো কারো মতে যে কোষ, লেফাফা বা জুযদানের মধ্যে কুরআন শরীফ রাখা হয় এবং তা থেকে আবার বের করা যায় তা-ই গেলাফ। অনুরূপ বিনা অযুতে তাফসীর গ্রন্থসমূহ এবং এমন কোন বস্তু স্পর্শ করা উচিত নয় যার ওপর কুরআনের কোনো আয়াত লিখিত আছে। কিন্তু ফিকহের গ্রন্থসমূহ স্পর্শ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও উত্তম হচ্ছে বিনা অযুতে স্পর্শ না করা। কারণ দলীল প্রমাণ হিসেবে তার মধ্যে কুরআনের আয়াত লিখিত থাকে। হানাফী ফকীহদের কারো কারো মত হচ্ছে, কুরআন মজীদের যে অংশে আয়াত লিখিত আছে শুধু সেই অংশ বিনা অযুতে স্পর্শ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে অংশে টীকা লেখা হয় তা ফাঁকা হোক কিংবা ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু লেখা থাক তা স্পর্শ করায় কোনো দোষ নেই। তবে সঠিক কথা হলো, টীকা বা ব্যাখ্যাসমূহও কুরআনেরই একটা অংশ এবং তা স্পর্শ করা কুরআন মজীদ স্পর্শ করার শামিল। এরপর কুরআন শরীফ পড়া সম্পর্কে বলা যায় যে, বিনা অযুতে কুরআন শরীফ পড়া জায়েয।" ফতোয়ায়ে আলমগীরী গ্রন্থে শিশুদেরকে এই

www.bjilibrary.com

নির্দেশের আওতা বহির্ভূত গণ্য করা হয়েছে। অযু থাক বা না থাক শিক্ষার জন্য শিশুদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়া যেতে পারে।

ইমাম নববী (র) 'আল্ মিনহাজ' গ্রন্থে শাফেয়ী মযহাবের মতামত বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ নামায ও তাওয়াফের মত বিনা অযুতে কুরআন মজীদ স্পর্শ করা কিংবা তার কোনো পাতা স্পর্শ করা হারাম। অনুরূপভাবে কুরআনের জিলদ স্পর্শ করাও নিষেধ। তাছাড়া কুরআন যদি কোনো থলি বা ব্যাগের মধ্যে রাখা থাকে, কিংবা কোনো গেলাফ বা বাক্সের মধ্যে থাকে বা দরসে কুরআনের জন্য তার কোনো অংশ কোনো ফলকের ওপরে লিখিত থাকে তাও স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে যদি কারো মালপত্রের মধ্যে রাখা থাকে, কিংবা তাফসীর গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ থাকে অথবা কোনো মুদ্রার গায়ে তা ক্ষোদিত হয়, তাহলে তা স্পর্শ করা বৈধ। শিশুর অযু না থাকলেও সে কুরআন স্পর্শ করতে পারে। কেউ যদি অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করে তাহলে কাঠ বা অন্য কোনো জিনিসের সাহায্যে পাতা উল্টাতে পারে।

'আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ' গ্রন্থে মালেকী মযহাবের যে মত উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের সাথে তারা এ ব্যাপারে একমত যে, হাত দিয়ে কুরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত। কিন্তু কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনে তারা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কে এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। এমনকি তাদের মতে শিক্ষার জন্য ঋতুবতী নারীর জন্যও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয। ইবনে কুদামা আল-মুগনী গ্রন্থে ইমাম মালিকের (র) এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায় তো কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ, কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন পড়ার অনুমতি আছে। কারণ আমরা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখি তাহলে সে তা ভুলে যাবে।

ইবনে কুদামা হাম্বলী মযহাবের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে নাপাক এবং হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন কিংবা কুরআনের পূর্ণ কোনো আয়াত পড়া জায়েয নয়। তবে বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি পড়া জায়েয। কারণ, এগুলো কুরআনের কোনো না কোনো আয়াতের অংশ হলেও সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে

www.bjilibrary.com

কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য থাকেনা। তবে কোনো অবস্থায়ই বিনা অযুতে হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নয়। পত্রে কিংবা ফিকাহর কোনো গ্রন্থ বা অন্য কোন লিখিত বিষয়ের মধ্যে যদি কুরআনের কোনো আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা নিষেধ নয়। অনুরূপভাবে কুরআন যদি কোনো জিনিসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, তাহলে অযু ছাড়াই তা হাত দিয়ে ধরে উঠানো যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহ হাত দিয়ে ধরার ক্ষেত্রে অযু শর্ত নয়। তাছাড়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অযুহীন কোনো লোককে যদি হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হয় তাহলে সে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে হাম্বলী মযহাবের এ মাসয়ালাটিও উল্লেখ আছে যে, "শিক্ষার উদ্দেশ্যেও শিশুদের বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ঠিক নয়। তাদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়ার আগে তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য তাদের অযু করানো।"

এ মাসয়ালা সম্পর্কে জাহেরী মাযহাবের মত হচ্ছে, কেউ বিনা অযুতে থাক বা নাপাক অবস্থায় থাক কিংবা ঋতুবতী স্ত্রী লোক হোক সবার জন্য কুরআন পাঠ করা এবং হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় জায়েয। ইবনে হাযম তাঁর আল-মুহাল্লা গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৭৭ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা) এ মাসয়ালা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাতে এ মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বহু দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরআন পাঠ করা এবং তা স্পর্শ করার ব্যাপারে ফকীহগণ যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন তার কোনোটিই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়।"[১]

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ টীকা-২৯।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের রক্ত সংক্রান্ত মাসআলা সমূহ

১০. হায়েয

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ، قُلْ هُوَ اَذًى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ ، وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○ (البقره : ٢٢٢)

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে : হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? তুমি বলো, সেটা একটা অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা। কাজেই তখন স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করবে এবং তাদের কাছে গমন করবেনা; যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। অতপর তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট গমন করবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।"

[আল বাকারা : ২২২]

মহিলাদের বিশেষ অংগ থেকে তিন ধরনের রক্ত বের হয়ে থাকে :

এক. সেই রক্ত, যা অসুখ বিসুখ বা রোগের কারণে বের হয়ে থাকে। এ রক্ত সাধারণত ন' বছর বয়সের আগে বের হয়, কিংবা এমন দিন বা বয়সে বের হয় যখন মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের রক্তকে 'ইস্তেহাজা' বা 'কুরুক্ত' বলা হয়।

www.bjilibrary.com

দুই. হায়েয, ঋতু বা মাসিকের রক্ত।

তিন. নিফাসের রক্ত।

হায়েয জিনিসটাকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে মেয়েদের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। নবী করীম (সা) তাঁর একটি বাণীতে একথাটিই বলেছেন। বণী ইসরাইলের লোকদের জন্য হায়েযের যে বিধি বিধান ছিলো, ইসলামের বিধি বিধান ও মাসআলা মাসায়েল তার চাইতে ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদীরা ঋতুবতীকে ঘর থেকে বের করে দিতো, পানাহারের সময় তাদেরকে সাথে রাখতোনা এবং তারা ঘরে অপর কারো সাথে থাকতে পারতোনা। আরব এবং আশেপাশের লোকেরাও ঋতুবতীদের সাথে ইহুদীদের এই অভ্যাসকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিল। তারাও ঋতুবতীদের সাথে অবস্থান এবং পানাহার পরিত্যাগ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে যখন নবী করীম (সা)–কে প্রশ্ন করা হলো, তখনই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম (সা) বলে দিয়েছেন : "ঋতুবতীর সাথে সহবাস ছাড়া আর সবকিছুই জায়েয।" ইহুদীরা তাঁর এই বক্তব্য জানতে পেরে বলে উঠলো : "এই লোকটি চায় কি? সেতো আমাদের রীতিনীতি কোনটিরই বিরোধিতা করতে বাদ দেয়নি।"

কুরআনের আয়াতটিতে 'মাহীজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে : 'তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'মাহীজ' সম্পর্কে নির্দেশ কি?' আরবী ভাষায় মাহীজ শব্দের কয়েকটি অর্থ হয় : এক. সেই সময়কাল যখন নারীর মাসিক চলে। দুই. ঋতু নির্গত হবার স্থান এবং তিন. ঋতুর রক্ত। অর্থাৎ 'মাহীজ শব্দটির মধ্যে এই তিনটি অর্থই নিহিত রয়েছে।

'হায়েয–এর শাব্দিক অর্থ প্রবাহিত হওয়া এবং কেটে বের হওয়া। এ থেকেই আরবরা বলে থাকে 'হাদাস্ সাইল' (حاض السيل) প্লাবন এসেছে। 'হাদাতিশ্ শাজারাতু' (حاضت الشجر) গাছে গাছে কেটে বের হয়েছে সবুজের সমারোহ। এ থেকেই এসেছে 'হাউজ' (حوض) শব্দ। সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয় বলেই সেটাকে 'হাউজ' বলা হয়।

www.bjilibrary.com

সুতরাং রক্ত ফেটে বের হয় এবং প্রবাহিত হয় বলেই ঋতুকে 'হায়েয' বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয মানে সেই রক্ত, যা সুস্থাবস্থায় মেয়েদের বিশেষ অংগ থেকে নির্গত হয়। যা কোনো রোগ বা প্রসবের কারণে বের হয়না। যা বালিগ হবার পর থেকে বেরুতে আরম্ভ হয়ে থাকে। আর বালিগ হবার সর্বনিম্ন বয়স নয় বছর। যা স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসবে নিরাশ হবার পূর্ব পর্যন্ত বের হয়। এ প্রসংগে বিভিন্ন মযহাবের মতামত নিম্নে আলোচিত হলো।

ন' বছরের আগেই যদি রক্ত দেখা দেয়, কিংবা সেই বয়সে উপনীত হবার পরও যদি রক্ত দেখা দেয়, যে বয়সে উপনীত হলে স্বাভাবিকভাবে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্তান গর্ভধারণের ব্যাপারে নারীরা নিরাশ হয়ে যায়, তবে সেটা ঋতুর রক্ত নয়, বরং তা কুরক্ত বা রোগজনিত রক্ত।

নবী করীম (সা) বলেছেন, হায়েয গোটা নারী জাতির একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। একবার তিনি হজ্জে যাবারকালে হযরত আয়েশাকে (রা) সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাবারকালে তাঁর মাসিক শুরু হয়ে যায় এবং আরাফার দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এমতাবস্থায় তিনি কাঁদতে শুরু করেন। নবী করীম (সা) এসে দেখেন, আয়েশা কাঁদছেন। তিনি জানতে চাইলেন, তুমি কাঁদছো কেন?

হযরত আয়েশা (রা) বললেন : "লোকেরা উমরা করার পর ইহরাম খুলে নিয়েছে আর আমি এসব করা থেকে বঞ্চিত রয়েছি। সবাই তাওয়াফ করেছে। আমি তাও করতে পারিনি। এখন আরাফার দিন এসে গেছে অথচ আমি এই অবস্থায়।"

রাসূলে করীম (সা) বললেন : এটা মেয়েদের এক অপরিহার্য প্রাকৃতিক বিধান। আল্লাহ তায়ালা আদম কন্যাদের কপালে এটা লিখে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি উঠে গোসল করো এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও।

নারীদের ঋতু হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো কারণে কোনো নারীর ঋতু না হলে সেটা তার জন্য অস্বাভাবিক বিষয় এবং দু'চার

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রে এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে পারে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন।

হায়েযের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতভেদ

হায়েযের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আলিমগণের মধ্যে নিম্নরূপ মতপার্থক্য রয়েছে :

১. মালিকী মাযহাবের মত অনুযায়ী, যেসব মেয়ে বালিগ হবার কাছাকাছি পৌঁছেছে অর্থাৎ যাদের বয়স ৯ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে, তারা যদি রক্ত দেখে, তবে তারা বয়স্ক মহিলাদের কাছ থেকে জেনে নেবে। কোনো বয়স্ক অভিজ্ঞ মহিলা যদি এটাকে অকাট্যভাবে হায়েয বলে, কিংবা কিছুটা সন্দেহ নিয়েও হায়েয বলে, তবে এটাকে হায়েযই ধরতে হবে। তা না হলে কুরুক্ত বা রোগের রক্ত ধরে নিতে হবে। অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত ডাক্তারের মতকেও বয়স্ক মহিলাদের মতের অনুরূপ ধরতে হবে।

কিন্তু যদি ১৩ থেকে ৫০ বছরের মধ্যকার কোনো নারী রক্ত দেখতে শুরু করে, তবে এটাকে অবশ্যি হায়েযের রক্ত ধরতে হবে। যদি ৫০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে কোনো নারী রক্ত দেখে, তবে সেও অভিজ্ঞ মহিলাদের কাছে জেনে নেবে। কোনো অভিজ্ঞ মহিলা তার সঠিক অভিজ্ঞতার আলোকে যে সিদ্ধান্ত দেবে, তাই মেনে নেবে। কিন্তু পূর্ণ সত্তর বছরের কোনো মহিলার রক্ত দেখা দিলে তা যে হায়েয নয়, সে কথা অকাট্যভাবে ধরে নিতে হবে। এ ধরনের রক্তের নাম এস্তেহাযা। ৯ বছরের পূর্বে কোনো মেয়ের রক্ত দেখা দিলে সেটাও এস্তেহাযা বা কুরুক্ত।

২. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, ৯ বছরের মেয়ের রক্ত দেখা দিলে তা হায়েযেরই রক্ত। এরূপ মেয়ে রক্ত দেখার দিনগুলোতে নামায রোযা থেকে বিরত থাকবে। হায়েযের রক্ত সন্তান প্রসবের আশা থেকে নিরাশ হবার বয়েস পর্যন্ত এসে থাকে। হানাফী মাযহাবের গৃহীত মতানুযায়ী সন্তান প্রসবের আশা থেকে নিরাশ হবার বয়স হলো পঞ্চান্ন বছর। সুতরাং পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর যে রক্ত দেখা দেয় তা হায়েয নয়। অবশ্য পঞ্চান্নের পর কোনো মহিলা যদি একেবারে কালো কিংবা

www.bjilibrary.com

একেবারে টাটকা লাল রং–এর রক্ত দেখে তবে সেটাকে হায়েয গণ্য করতে হবে।

৩. হাম্বলী মাযহাবে সন্তান প্রসবের আশা থেকে নিরাশ হবার বয়স হলো পঞ্চাশ বছর। সুতরাং এ বয়সের পর কোনো নারী রক্ত দেখলে সেটা হায়েয নয়।

৪. শাফেয়ীদের মতে মাসিক শুরু হবে তখন, যখন মেয়েদের বয়স ৯ বছর পূর্ণ হবে। আর মাসিক বন্ধ হবার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। সুতরাং ৯ বছরের পর সারা জীবনই হায়েয হতে পারে। তবে সাধারণত ৬২ বছর বয়সে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত এটাই সেই বয়স, যেটাকে এই মযহাবে সন্তান প্রসবের আশা থেকে নিরাশ হবার বয়স ধরা হয়।

হায়েযের রক্ত হবার শর্ত

হায়েযের রক্তের জন্য পয়লা শর্ত হলো তা লাল, হল্‌দে কিংবা গাছলা(কালো এবং সাদার মাঝামাঝি) রং–এর হতে হবে। সুতরাং নিরেট সাদা জিনিস দেখলে তা হায়েয নয়।

হানাফীরা কালো, সবুজ এবং মেটে মেটে রংকেও হায়েযের রক্তের রং– এর মধ্যে গণ্য করেছেন। শাফেয়ীরা সেই সাথে কেবল কালো এবং লালচে হলুদ রং যোগ করেছেন।

হায়েযের রক্ত হবার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো মহিলাটি গর্ভবতী হবেনা। সুতরাং গর্ভবতীর রক্ত দেখা দিলে সেটাকে অসুখ জনিত রক্ত ধরে নিতে হবে, ঋতুর রক্ত নয়।

হায়েযের রক্ত হবার জন্য আরেকটি শর্ত হলো, রক্ত নির্গত হবার পূর্বে তুহরের[১] ন্যূনতম সময়কাল পার হতে হবে।

মালেকী এবং শাফেয়ীদের মতে গর্ভবতীর রক্ত দেখা দিলে সেটাও হায়েযের রক্ত হতে পারে। সুতরাং তাঁদের মতে হায়েযের রক্ত দেখা দেবার জন্য গর্ভাশয় গর্ভাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী নয়।

১. 'তুহর'–এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো, দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্র অবস্থা। –অনুবাদক।

www.bjilibrary.com

কিন্তু অনবরত দীর্ঘদিন রক্ত বেরুতে থাকলে সে ক্ষেত্রে শাফেয়ীদের মতে সাধারণত যে কয়দিন তার মাসিক চলে সেই সম-মুদ্দতকালের রক্তকেই হায়েযের রক্ত ধরে নিতে হবে। তার চাইতে অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তকে হায়েযের রক্ত ধরা যাবেনা।

মালেকীদের মতে গর্ভের দুই মাস পর থেকে ছয় মাসের মধ্যে যতো দিনই রক্ত দেখা যাক না কেন, কেবল বিশ দিনকেই হায়েযকাল ধরতে হবে। কিন্তু গর্ভকালের ছয় মাস থেকে শেষ পর্যন্ত যদি রক্ত বেরুতে থাকে তবে হায়েযকাল ত্রিশ দিন ধরতে হবে। গর্ভের প্রথম বা দ্বিতীয় মাসে যদি রক্ত দেখা দেয়, তবে সাধারণ অভ্যাসমতো ঋতুকালের হিসাব করতে হবে।

ঋতুকালের সময়সীমা

শাফেয়ীদের মতে হায়েযের নিম্নতম সময়কাল একদিন একরাত, সর্বোচ্চ সময়কাল পনের দিন এবং সাধারণ সময় ছয় বা সাত দিন।

হানাফীদের মতে ঋতুর ন্যূনতম সময়কাল তিন দিন তিন রাত এবং সর্বোচ্চ সময়কাল দশ দিন দশ রাত। কোনো মহিলার যদি ঋতুকালের একটা নির্ধারিত সময়সীমা থেকে থাকে অতপর কখনো যদি সে নির্ধারিত সময়কালের চাইতে বেশী দিন ঋতুকাল চলতে থাকে, তবে সর্বোচ্চ দশদিন পর্যন্ত হায়েয ধরা হবে। যেমন কোনো মহিলার যদি নির্ধারিত তিন দিন হায়েযকাল চলে অতপর হঠাৎ একবার চারদিন রক্ত দেখে, তবে ধরে নিতে হবে তার সাধারণ নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। তার এই চতুর্থদিনের রক্তও হায়েয বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তিন দিন হলো তার সাধারণ নিয়ম আর চতুর্থ দিন হলো নিয়মের পরিবর্তন। একইভাবে কারো ঋতুকাল যদি সাধারণ নিয়ম মতো চারদিন হয়ে থাকে অতপর কখনো যদি পঞ্চম দিনেও রক্ত দেখে, তবে এ রক্তও হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। এভাবে সাধারণ নিয়মের অধিক হলেও দশ দিন সময়কাল পর্যন্তকার রক্তকে হায়েযের রক্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু দশ দিনের পরও যদি রক্ত দেখা দেয়, তবে সেটাকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে।

www.bjilibrary.com

মালেকীদের মতে, ইবাদতের দৃষ্টিকোণ থেকে তো হায়েযের ন্যূনতম কোনো সময়সীমা নেই। রক্তের পরিমাণের দিক থেকেও সময়সীমা নেই। মুদ্দতের দিক থেকেও সময়সীমা নেই তাই কোনো মহিলা যদি মুহূর্তের জন্যও কিছু না কিছু রক্ত দেখে, তবে তাকে ঋতুবতী মনে করতে হবে।

কিন্তু ইদ্দত এবং ইস্তেবরা[১] এর দৃষ্টিকোণ থেকে মালেকীদের মতে হায়েযের ন্যূনতম সময়কাল একদিন বা দিনের কিছু অংশ এবং সর্বোচ্চ সময়কালের কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। এটা ঠিক সে রকম, যেমন তার কতটুকু রক্ত নির্গত হলো তার পরিমাণ নির্ধারিত করা যায়না। অবশ্য যে মহিলার প্রথমবার ঋতু দেখা দেয়, সে যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তার সর্বোচ্চ ঋতুকাল পনের দিন।

তুহুরের ন্যূনতম সময়

হানাফীদের মতে তুহুরের ন্যূনতম মুদ্দত পনের দিন। সর্বোচ্চ মুদ্দতকাল নির্ধারিত নেই।

হাম্বলীদের মতে তুহুরের ন্যূনতম মুদ্দতকাল তের দিন।

ঋতুকালের বিরতিকাল

ঋতুর মুদ্দতকালে কোনো একদিন যদি রক্ত দেখা না যায়, তবু সেদিনটি ঋতুকালের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন পয়লা দিন রক্ত দেখা গেলো, কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেলনা, এভাবে ঋতু চলাকালে মাঝে মধ্যে যদি রক্ত না দেখা যায়, তবুও সেদিনগুলো ঋতুকালের মধ্যে গণ্য হবে।

কিন্তু হাম্বলী মযহাবের মতে ঋতু চলা কালেও যদি মাঝখানে কোনোদিন রক্ত দেখা না যায়, তবে সেদিনটি তুহুর বলে গণ্য হবে। এই দিনটিতে মহিলা এমনসব কাজই করতে পারবে যা একজন অঋতুবতী মহিলা করতে পারে।

---

১. ইস্তেবরা মানে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যে নারীর গর্ভাশয় গর্ভমুক্ত। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

১১. নিফাস

'নিফাস' সেই রক্তকে বলা হয়, সন্তান প্রসবের পর মেয়েদের বিশেষ অংগ থেকে যে রক্ত নির্গত হয়। সুতরাং কোনো মহিলা যদি সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান বের করে নেয় এবং তার বিশেষ অংগ দিয়ে রক্ত না আসে, তবে সে নুফাসা (نفساء)[১] বলে গণ্য হবেনা। নিফাসের রক্ত সংক্রান্ত বিধানও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। অবশ্য সন্তান এভাবে পয়দা হলেও ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

কোনো মহিলার যদি গর্ভপাত হয়, তবে প্রসবকৃত সন্তানের মধ্যে যদি স্পষ্ট মানবাকৃতি দেখা যায়, আংগুল, নখ এবং চুল গজিয়ে থাকে, তবে সেটা সন্তান বা মানব শিশু বলে গণ্য হবে এবং এরূপ গর্ভপাতের পর নির্গত রক্ত নিফাস বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাতে যদি মানব আকৃতি পরিস্ফুট না হয়ে থাকে, যদি কেবল রক্তের পিণ্ড কিংবা মাংসপিণ্ড হয়ে থাকে, তবে এরূপ গর্ভপাতের পর রক্ত দেখা দিলে সেটাকে হায়েয বলা যেতে পারে। যদি এমন সময়ের মধ্যে এই রক্তটা দেখা দিয়ে থাকে যখন নিয়ম অনুযায়ী হায়েযের সময়, তবে সেটাকে হায়েযের রক্ত মনে করতে হবে, নতুবা সেটা অন্য কোনো কুরক্ত হবে।

জমজ সন্তান প্রসব

কোনো মহিলা যদি জমজ সন্তান প্রসব করে (অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সন্তান একবারে প্রসব করে), তবে নিফাসের মুদ্দত গণনা শুরু করতে হবে প্রথমটির প্রসবের পর থেকে। মানে–প্রথম ও পরবর্তী শিশুর প্রসবের মাঝখানে যদি কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে, তবে প্রথমটি প্রসবের পর থেকেই নিফাসের মুদ্দত গণনা করতে হবে। এমনকি এই ব্যবধান বা বিরতি নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দতের সমান হলেও। তাই দ্বিতীয়

১. সেই সব নারীদের 'নুফাসা' বলা হয়, সন্তান প্রসবের পর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যাদের বিশেষ অংগ দিয়ে রক্ত নির্গত হয়। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

বাচ্চা যদি প্রথমটির চল্লিশ দিন পর ভূমিষ্ঠ হয়, তবে দ্বিতীয়টির জন্মের পর নির্গত হওয়া রক্ত নিফাস বলে গণ্য হবেনা। বরং এ রক্তকে রোগ-জনিত রক্ত বা কুরক্ত মনে করতে হবে। এ হচ্ছে হানাফী মযহাবের মত।

নিফাসের মুদ্দত

নিফাসের সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং সর্বনিম্ন সময় এক নিমেষ বা এক মুহূর্তও হতে পারে। তাই কোনো মহিলা যদি বাচ্চা প্রসব করে এবং প্রসবের পরপরই যদি রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা যদি বাচ্চা জন্ম হয় আর রক্ত নির্গতই না হয়, তবে এরূপ অবস্থায় তার নিফাসের মুদ্দত শেষ হয়ে যাবে। এরূপ মহিলার জন্য এমন সব কাজ করাই ওয়াজিব, যেসব কাজ একজন পবিত্র মহিলার জন্য ওয়াজিব।

কারো কারো মতে নিফাসের সর্বনিম্ন মুদ্দত এক নিমেষ আর সর্বোচ্চ মুদ্দত চল্লিশ দিন।

নিফাস চলা কালের বিরতি

নিফাসের মুদ্দতকালের মধ্যে যদি মাঝে মধ্যে রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ থাকে, যেমন আজ রক্ত নির্গত হলো, কাল নির্গত হলোনা, পরশু আবার নির্গত হলো, তবে মাঝের এই বিরতির দিনটির ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? এ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিম্নে সেসব মতভেদ উল্লেখ করা গেলো ঃ

১. হানাফীদের মতে নিফাসের মুদ্দত চলাকালে মাঝে মধ্যে যেসব দিন রক্ত নির্গত হবেনা, সেসব দিনও নিফাসের দিন বলে গণ্য হবে।

২. হাম্বলী মাযহাবের মতে নিফাস চলাকালে মাঝে কোনো দিন যদি রক্ত নির্গত না হয়, তবে সে দিনটি তহুর বা পবিত্র দিন বলে গণ্য হবে।

৩. শাফেয়ীদের মতে, নিফাস চলাকালে মাঝখানে যদি পনের দিন বা পনের দিনের বেশী সময় রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ থাকে, তবে এই বিরতিকাল তুহুর বা পবিত্র দিন বলে গণ্য হবে। এইরূপ বিরতিকালের

www.bjilibrary.com

পর পুনরায় রক্ত দেখা দিলে সে সময়টাও তুহুর বলে গণ্য হবে। কিন্তু বিরতিকাল যদি পনের দিনের চাইতে কম হয়, অর্থাৎ মাঝখানে যদি পনের দিনের চাইতে কম সময় রক্ত না দেখে, তবে, বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী এই বিরতির দিনগুলো নিফাসের দিন বলেই গণ্য হবে।

৪. মালেকীদের মতে এই বিরতিকাল যদি অর্ধমাসকাল হয়, তবে তা তুহুর বলে গণ্য হবে। এর পর যে রক্ত দেখা দেবে সেটাকে মাসিকের রক্ত ধরে নিতে হবে। কিন্তু বিরতিকাল যদি অর্ধমাসের চাইতে কম হয়, তবে তার পরবর্তীতে দেখা যাওয়া রক্তকেও নিফাস বলেই গণ্য করতে হবে। নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত এভাবে হিসাব করতে হবে যে, কেবলমাত্র রক্ত দেখা যাওয়ার দিনগুলো গণনা করতে হবে। বিরতির দিনগুলোকে গণনার বাইরে রাখতে হবে। এভাবে ৬০ (ষাট) দিন পূর্ণ হলে নিফাসকাল শেষ হয়েছে বলে ধরতে হবে।

এই বিরতির দিনগুলোতে মহিলা সেই সব কাজই করতে পারবে এবং তাঁকে করতে হবে, যা একজন পবিত্র মহিলা করে থাকে বা করতে হয়। যেমন নামায পড়া, রোযা রাখা প্রভৃতি।

www.bjilibrary.com

১২. ইস্তেহাযা বা কুরুক্ত

হায়েয এবং নিফাসের স্বাভাবিক রক্ত ছাড়া মেয়েদের গুপ্তাংগ থেকে অন্য কোনো অস্বাভাবিক রক্ত নির্গত হলে সেটার নাম ইস্তেহাযা বা কুরুক্ত। হায়েয ও নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ শেষ হবার পরও যদি রক্ত নির্গত হয়, কিংবা হায়েয ও নিফাসের সর্বনিম্ন সময়ের চাইতেও কম সময়ের জন্য যে রক্ত নির্গত হয়, অথবা নয় বছর বয়েস হবার পূর্বে যে রক্ত নির্গত হয়, সেটাই ইস্তেহাযা বা কুরুক্ত। মূলত ইস্তেহাযা রোগ জনিত রক্ত। স্বাভাবিক কারণে নির্গত রক্ত নয়। যেমন, নবী করীম (সা) বলেছেন : "এটা হায়েয নয়, অপর কোনো রগ থেকে আসা রক্ত।"

কুরুক্ত যদি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে বসে

কোনো মহিলার যদি দীর্ঘদিন ধরে রক্ত নির্গত হতে থাকে, তবে তার মধ্যে কতো দিনকে হায়েয ধরা হবে আর কতোদিনের রক্তকে কুরুক্ত ধরা হবে, সে বিষয়ে যেমন ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, ঠিক তেমনি এ বিষয়েও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, কোনো নারীর যদি ইস্তেহাযা লেগেই থাকে, তবে তার মধ্যে কোন্ সময়টিতে তার উপর ঋতুবতীর বিধান বর্তাবে?

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, এরূপ মহিলা প্রতি মাসে তার মাসিকের স্বাভাবিক নিয়ম মতো সময়টিতে ঋতুবতী গণ্য হবে। কোনো মেয়ের যদি প্রথমবারের মাসিক শুরু হয়ে থাকে এবং তার মাসিকের স্বাভাবিক মেয়াদকাল নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে, তবে মাসিকের সর্বোচ্চ মুদ্দতকাল যতোদিন, ঐ মহিলা কেবল ততোদিন নিজেকে ঋতুবতী গণ্য করবে। (উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফার মতে মাসিকের সর্বোচ্চ মুদ্দতকাল দশ দিন), বাকী দিনগুলোতে মহিলা নিজেকে 'মুস্তাহাযা' বা 'কুরুক্তের রোগী' মনে করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, মহিলাটির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার হায়েয এবং কুরুক্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়, তবে তো সে

www.bjilibrary.com

পার্থক্য অনুসারেই তাকে আমল করতে হবে। কিংবা তার হায়েযের যদি কোনো স্বাভাবিক মেয়াদকাল থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রেও হায়েযের ফায়সালা হবে সেই স্বাভাবিক মেয়াদকাল অনুযায়ী। আর মহিলাটির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার হায়েযের স্বাভাবিক মেয়াদকাল নির্দিষ্ট আছে আর তার হায়েয এবং কুরুক্তের মধ্যেও পার্থক্য করা যায়, তবে এরূপ মহিলার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর দুই মত পাওয়া যায়। একটি মত অনুযায়ী মহিলাটি পার্থক্য অনুযায়ী আমল করবে। আরেকটি মত অনুযায়ী স্বাভাবিক মেয়াদকাল অনুযায়ী আমল করবে।

কিন্তু যদি কোনো মহিলার অবস্থা এমন হয় যে, প্রতি মাসে তার কয়দিন মাসিক চলে তাও নির্ধারিত নেই এবং তার হায়েয আর কুরুক্তের মধ্যে পার্থক্যও করা যায়না, তবে এরূপ মহিলা প্রতিমাসে একদিন একরাত ঋতুবতী গণ্য হবে। মাসের বাকী দিনগুলোতে পবিত্র গণ্য হবে। যেমন কোনো মহিলার প্রথমবার মাসিক শুরু হলো। তার মাসিক কয়দিন চলে সেরূপ কোনো নিয়মও নির্দিষ্ট হয়নি। তাছাড়া তার হায়েয এবং কুরুক্তের মধ্যেও পরখ করা যায়না। তবে তার জন্য এই বিধান।

মালেকী মযহাবের মতে, যে মহিলার অবিরাম রক্ত নির্গত হয়, সে ততোক্ষণ পর্যন্ত অঋতুবতী গণ্য হবে, যতোক্ষণ না তার রক্তের মধ্যে স্পষ্টভাবে হায়েযের বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। হায়েযের বৈশিষ্ট্য বুঝা মানে রক্তের ধরন, গন্ধ, ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা বুঝতে পারা। তাই যেদিনগুলোতে হায়েযের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সেগুলোই তার হায়েযের দিন। তবে শর্ত হলো, দু' হায়েযের মাঝখানে কমপক্ষে পনের দিন (পবিত্রতার) পার্থক্য থাকতে হবে।

কিন্তু যদি হায়েয এবং কুরুক্তের মধ্যে পার্থক্য করা না যায় কিংবা যদি তুহরের নিম্নতম মুদ্দত (অর্থাৎ পনের দিন) পার না হতেই রক্তের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তবে এই দিনগুলোও কুরুক্তের দিন বলেই গণ্য হবে। অর্থাৎ মহিলাটি এ সময় পবিত্র মহিলার মতোই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। সারাজীবনও যদি তার অবস্থা এ রকম চলে, তবুও।

www.bjilibrary.com

হাদীসের আলোকে এরূপ মহিলাকে সন্দেহযুক্ত রক্তের অধিকারী বলা যেতে পারে। কিন্তু যে মহিলা রক্তের পার্থক্য করতে পারে, সে কেবল সতর্কতার জন্য তিন নয়, বরং যতোদিন ঋতুর রক্তের চাইতে ভিন্ন ধরনের রক্ত নির্গত হবে, ততোদিন পূর্ব অভ্যাস বা নিয়ম অনুযায়ী ফায়সালা করবে। তবে এরূপ অবস্থা যদি সব সময় চলে তবে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী যে মহিলার সব সময় রক্ত নির্গত হয়, তার দুটি অবস্থা হতে পারে। এক, হয়তো তার হায়েযের সময়কাল নির্ধারিত আছে। দুই, নয়তো তার প্রথমবার মাসিক দেখা দিয়েছে এবং পূর্ব থেকে কোনো অভ্যাস বা সময়কাল নির্ধারিত নেই।

সুতরাং যে মহিলার অভ্যাস বা সময়কাল নির্দিষ্ট আছে, সে সেই অনুযায়ীই আমল করবে। অর্থাৎ অভ্যাসমতো যতোদিন তার হায়েয আসার কথা, ততোদিনকেই হায়েয বলে গণ্য করবে। অভ্যাস নির্দিষ্ট থাকা মহিলার ক্ষেত্রে রক্তের পার্থক্য দেখার প্রয়োজন নেই।

আর যে মেয়ের প্রথমবার মাসিক শুরু হয়েছে। পূর্ব থেকে কোনো অভ্যাস নির্দিষ্ট নাই, তার দু'টি অবস্থা হতে পারে। অর্থাৎ তার রক্ত হয়তো এমন হবে যে, হায়েয এবং কুরক্তের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, নয়তো এমন হবে যে, পার্থক্য করা যায়না।

পার্থক্য করা গেলে পার্থক্য অনুযায়ী আমল করবে। তবে শর্ত হলো ঘন রক্তটাকে মাসিকের রক্ত গণ্য করবে এবং মুদ্দতকাল হবে কমচে কম একদিন এক রাত এবং সর্বাধিক পনের দিন। আর তার রক্তে যদি পার্থক্য করা না যায়, তবে তার হায়েযের সময়কাল ধরতে হবে একদিন এক রাত। অতপর সে গোসল করবে এবং এমন সব কাজই করবে, যা করে থাকে একজন পবিত্র (অঋতুবতী) নারী। কিন্তু এ বিধান কেবল প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসের জন্য। চতুর্থ মাসে তার হায়েযের মেয়াদ ধরতে হবে সেই ক'দিন। যে ক'দিন সাধারণত মেয়েদের হায়েয অবস্থা থাকে। অর্থাৎ ছয় বা সাত দিন। এসব ক্ষেত্রে মহিলাটি নিজেই ভালভাবে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবে।

www.bjilibrary.com

মতপার্থক্যের কারণ

এ ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে যে মতপার্থক্য, তার কারণ দু'টি হাদীসের দু' রকম বক্তব্য।

(১) প্রথম হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ এস্তেহাযার (কুরক্তের) রোগী ছিলেন। তিনি তাঁর এ রোগের ব্যাপারে নবী করীমের (সা) নিকট ফতোয়া চাইতে এলে নবী করীম (সা) বলেন, সেই কদিন নামায ত্যাগ করবে, এ রোগ শুরু হবার পূর্বে তোমার যে কয়দিন মাসিক চলতো। অতপর গোসল করে নেবে এবং নামায পড়বে।

(২) দ্বিতীয় হাদীসটিও ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশের সূত্রেই উদ্ধৃত হয়েছে আবু দাউদে। তাতে বলা হয়েছে, ফাতিমা কুরক্তের রোগী ছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে হিদায়াত দিয়েছিলেন, হায়েযের রক্ত কালচে হয়ে থাকে এবং সাধারণ রক্ত থেকে তার পার্থক্য বুঝা যায়। তাই যতোদিন এরূপ রক্ত দেখবে, ততোদিন নামায ত্যাগ করবে। আর যখন ভিন্ন রং-এর রক্ত দেখবে, তখন অযু করে নামায পড়ে নেবে। কারণ এ রক্ত অন্য কোনো রগ থেকে আসা রক্ত।

আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন।

ইস্তেহাযার রোগী কিভাবে পবিত্র হবে?

ইস্তেহাযা বা কুরক্তের রোগী কিভাবে পবিত্র হবে, সে ব্যাপারে চারটি মত আছে ঃ

১. একটি মতানুযায়ী এরূপ মহিলার জন্য কেবল একবার পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

২. আরেকটি মতানুযায়ী তার প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী।

৩. তৃতীয় আরেকটি মতানুযায়ী এরূপ মহিলার দিন রাত্রে তিন বার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী।

৪. চতুর্থ মত হলো, তার দিন রাত্রে একবার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী।

www.bjilibrary.com

পয়লা মতানুযায়ী এরূপ মহিলার একবার পাক-পবিত্র হওয়া জরুরী। এ পবিত্রতা অর্জন করবে তখন, যখন সে বুঝবে কিংবা অনুভব করবে যে, তার হায়েযের মুদ্দত শেষ হয়েছে। হায়েযের মুদ্দত কখন শেষ হবে, সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

যেসব ফকীহ একবার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী মনে করেন, তাদের মধ্যে আবার দু'টি দল রয়েছে। একটি দলের মতে, এরূপ মহিলার প্রত্যেক নামাযে নতুন অযু করা জরুরী। অপর দলের মতে প্রত্যেক নামাযে নতুন অযু করা জরুরী নয়, মুস্তাহাব। অর্থাৎ মহিলা ইচ্ছা করলে এক অযুতে সব নামায পড়তে পারে, কিংবা প্রত্যেক নামাযে নতুন নতুন অযু করতে পারে।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁদের সাথীরা এরূপ মহিলার কেবল একবার পবিত্রতা অর্জন করাই ওয়াজিব মনে করেন। এঁরা ছাড়াও আরো বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকাংশ ফকীহ এমতই পোষণ করেন। এদের অধিকাংশই আবার প্রত্যেক নামাযে অযু করা ওয়াজিব মনে করেন। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। আর এমতটি হলো ইমাম মালিকের।

দ্বিতীয় মত হলো, ইস্তহাযা বা কুরন্তের রোগী প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক গোসল করবে।

তৃতীয় মত হলো, এরূপ রোগীর জন্য দিন রাতে তিনবার গোসল করা ওয়াজিব। এই মত যাদের, তাদের বক্তব্য হলো, এরূপ মহিলা যুহরের নামায আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। অতপর গোসল করে যুহর এবং আসর নামায একত্রে পড়বে। একইভাবে মাগরিবের নামায মাগরিবের শেষ সময় এবং এশার সূচনা লগ্ন পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। অতপর গোসল করে এ দু'টি নামায একত্রে আদায় করবে। আর তৃতীয়বার গোসল করবে ফজর নামাযের জন্য। এভাবে তাঁরা দিনরাতে তিনবার পবিত্রতা অর্জন বা গোসল করা ওয়াজিব বলেছেন।

চতুর্থ মতানুযায়ী দিনরাতে একবার গোসল করা ওয়াজিব। কিন্তু এই মতটি যাদের তাদের মধ্যে কিছু কিছু আলিম এ গোসলটির কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। হযরত আলী (রা) থেকেও এ মতই বর্ণিত

www.bjilibrary.com

হয়েছে। এঁদের মধ্যকার কিছু ফকীহ আবার এরূপ মহিলার জন্য এটাও জরুরী মনে করেছেন যে, তারা প্রথম দিন যুহরের নামাযের জন্য গোসল করবে। অতপর দ্বিতীয় দিনও যুহর নামাযের সময় গোসল করবে।

মতপার্থক্যের কারণ

এ প্রসঙ্গে ফকীহ আলিমগণের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তার কারণ হলো, এ বিষয়ে যেসব হাদীস পাওয়া যায় স্বয়ং সেই হাদীসগুলোই মতপার্থক্যপূর্ণ। এ সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা চারটি। তন্মধ্যে একটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সবাই একমত। অপর তিনটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

(১) প্রথম হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বিশুদ্ধ। এটি বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা)। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ নবী করীমের (সা) নিকট এসে আবেদন করলেন : "আমি ইস্তেহাজা বা কুরস্তের রোগী। রক্ত সব সময় বের হয়। কখনো পবিত্র হইনা অর্থাৎ কখনো রক্ত বন্ধ হয়না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ত্যাগ করবো?" জবাবে নবী করীম (সা) বললেন : "না, নামায ত্যাগ করবেনা। কারণ এটা অন্য কোনো রগ থেকে আগত রক্ত, হায়েয নয়। সুতরাং যে ক'দিন হায়েযের রক্ত নির্গত হবে, কেবল সে ক'দিনই নামায ত্যাগ করবে। আর যখন হায়েয বন্ধ হয়ে যাবে, তখন শরীর থেকে রক্ত ধুইয়ে ফেলে নামায পড়বে।"

কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাটা বেশী আছে যে, "এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে।" এই সংযোজনটি বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়নি। অবশ্য আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞ এই সংযোজনকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

(২) দ্বিতীয় হাদীসটিও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আউফের স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশের ইস্তেহাযার রোগ দেখা দেয়। নবী করীম (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে নির্দেশ দেন।"

(৩) তৃতীয় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদে, যেটিকে ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আসমা

www.bjilibrary.com

বিনতে উমাইস (রা)। তিনি বলেন ঃ "ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইসের ইস্তেহাযার রোগ দেখা দেয়। নবী করীম (সা) তাকে হেদায়াত দিয়েছেন, সে যেন যুহর এবং আসর নামাযের জন্য একবার গোসল করে, মাগরিব এবং এশার জন্য একবার গোসল করে এবং ফজর নামাযের জন্য একবার গোসল করে। এছাড়া দু' গোসলের মাঝখানের (নামাযের জন্য) যেন অযু করে।

(৪) চতুর্থ হাদীসটি হযরত হামনা বিনতে জাহশ সংক্রান্ত। নবী করীম (সা) তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সে যখন অনুভব করবে এখন হায়েযের রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়েছে, তখন সে ইচ্ছা করলে একই গোসলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারে, কিংবা প্রতিদিন তিনবার গোসল করতে পারে, যেমনটি বলা হয়েছে আসমা বিনতে উমাইস বর্ণিত হাদীসে। তবে পার্থক্য হলো, আসমার (রা) হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, দিনরাতে তিনবার গোসল করা ওয়াজিব। কিন্তু এই হাদীসে তিনবারের বিষয়টি রোগীর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এই হাদীসে দিন রাতে একবার গোসল করা ওয়াজিব। তিনবার করাটা রোগীর ইচ্ছাধীন।

ইস্তেহাযা রোগীর করণীয়

ইমাম নববী তাঁর 'আল-মিনহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, ইস্তেহাযা এমন একটি রোগ, যাতে মহিলারা অবিরাম নাপাক থাকে, যেমনটি থাকে পেশাবের রোগীরা, অর্থাৎ যাদের সবসময় ফোটা ফোটা পেশাব নির্গত হয়। তাই এই রোগের কারণে নামায-রোযা করা নিষেধ হয়না। যে মহিলা ইস্তেহাযার রোগী হবে, তার করণীয় হলো, অযু করার পূর্বে স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে ধুইয়ে নিয়ে শক্তভাবে নেকড়া বেঁধে নেবে। প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত হলেই অযু করবে এবং বিলম্ব না করে নামায পড়ে নেবে। প্রত্যেক নামাযের জন্যই অযু করা ফরয। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন নেকড়া পরাও ফরয।

ইস্তেহাযার রোগীর জন্য যেসব কাজ নিষেধ নয়

হায়েয এবং নিফাসের সময় যেসব কাজ করা নিষেধ ইস্তেহাযার সময় সেগুলো নিষেধ নয়। যেমন, নামায পড়া, রোযা থাকা, কুরআন

www.bjilibrary.com

তিলাওয়াত করা, কুরআন স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা, ই'তেকাফে বসা, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা, সহবাস করা ইত্যাদি। মোট কথা, ইস্তেহাযার রোগীর এসব কাজ করার জন্য গোসল করা জরুরী নয়। অবশ্য কোনো কোনো কাজ অযু ছাড়া করা যায়না। অবশ্য দু'টি বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। একটি হলো, নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জনের পন্থা কি? অপরটি হলো এরূপ মহিলার সাথে সহবাস করার বিধান কি? এ দু'টি বিষয় পৃথক উপশিরোনামে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম মালিক বলেছেন, ফকীহ এবং আলিমগণের মতে রক্ত যত বেশীই নির্গত হোকনা কেন, ইস্তেহাযার রোগীর জন্য উপরোল্লেখিত কাজগুলো করা জায়েয। ইমাম মালিকের এই কথাটি ইবনে ওহাব বর্ণনা করেছেন।

ইস্তেহাযার রোগীর বিধান ঐসব লোকের মত, যাদের কোনো না কোনো ওযর আছে। ঐ ব্যক্তির মত যার অনবরত পাতলা পায়খানা হয়। কিংবা ঐ ব্যক্তির মত, যার সবসময় ফোটা ফোটা পেশাব নির্গত হয়। কিংবা ঐ ব্যক্তির মত যার নাক দিয়ে সবসময় ফোটা ফোটা রক্ত পড়ে। কিংবা ঐ ব্যক্তির মত যার এমন কোনো জখম আছে যেখান থেকে অবিরাম রক্ত বা পূঁজ নির্গত হয়।

ইস্তেহাযার রোগীর সাথে সহবাস

ইস্তেহাযার রোগীর সাথে সহবাস করার ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে ঃ

(১) একদল আলিম এরূপ মহিলার সাথে সহবাস করাকে জায়েয বলেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক আলিমই এ মত পোষণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র) এবং আরো বহু সংখ্যক তাবেয়ী থেকে এ মতই বর্ণিত হয়েছে।

(২) কিছু কিছু আলিম মনে করেন, এরূপ অবস্থায় সহবাস করা জায়েয নয়। হযরত আয়েশা (রা), ইব্রাহীম নখয়ী (র) এবং হাকাম (র) থেকে এ মত বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের যুক্তি হলো, রক্ত সর্বাবস্থায়ই

www.bjilibrary.com

নোত্তা। সর্বাবস্থায়ই শরীর এবং কাপড় থেকে রক্ত ধুইয়ে ফেলা ওয়াজিব। সুতরাং রক্ত হায়েযের হোক কিংবা ইস্তেহাযার, এই উভয় অবস্থার সহবাসের একই বিধান। কেননা, দু'টোই অপবিত্র রক্ত। আর ইস্তেহাযা অবস্থায় নামায পড়া যাবে কিনা? এ প্রশ্নের জবাব হলো, সুন্নাতে রাসূল থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সময় নামায পড়া বা না পড়ার ব্যাপারে অবকাশ দেয়া হয়েছে। যেমন, ঐ ব্যক্তিও নামায পড়তে পারে, যার সব সময় ফোটা ফোটা পেশাব ঝরে।

এ মতটি সাধারণ আলিমদের মতের বিপরীত।

(৩) আরেক দল আলিমের মত হলো, এরূপ রোগীর সাথে স্বামীর জন্য কেবল তখনই সহবাস করা বৈধ, যখন রোগ (ইস্তেহাযা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এ মত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের।[১]

মতভেদের কারণ

এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ হলো, ইস্তেহাযার রোগীর জন্য তো নামায পড়া জায়েয। তাহলে তার পক্ষে নামায পড়ার এ বৈধতা কি অবকাশ জনিত। কিন্তু তা হবে কেন? নামায পড়া তো এমন এক ফরয, যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা বা অবকাশের কোনো প্রশ্নই উঠেনা। নাকি ইস্তেহাযার রোগী আইনগতভাবে পবিত্র? আর সে জন্যই এ সময় তার নামায পড়া জায়েয?

এ ক্ষেত্রে যেসব আলিম এ সময় নামায পড়ার অনুমতিকে ঐচ্ছিক মনে করেছেন, তাদের মতে ইস্তেহাযার রোগীর সাথে রোগ চলাকালে স্বামীর সহবাস করা বৈধ নয়। আর যারা মনে করেন ইস্তেহাযার সময় মহিলারা আইনগতভাবে পবিত্র থাকে, তাদের মতে এ সময় স্বামীর পক্ষে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ।

আসল কথা হলো, এ বিষয়ে শরীয়তের কোনো স্পষ্ট হুকুম বর্তমান নেই।

---

১. মতামত উদ্ধৃত হলো ইবনে রুশদের "বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে।

www.bjilibrary.com

১৩. গোসল

গোসল সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বাণী হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ، وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

(النساء : ٤٣)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো, তখন নামাযের কাছেও যেয়োনা। নামায পড়বে তখন, যখন সঠিকভাবে জানতে পারবে যে, কি বলছো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যাবেনা, যতোক্ষণ না গোসল করে নেবে। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী অবস্থায় থাকো, সে ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হবেনা। আর যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ো, কিংবা সফর অবস্থায় থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা সেরে আসে, অথবা যদি স্ত্রী সহবাস করো আর এসব অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো। তা দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল এবং হাত মাসেহ করো। নিসন্দেহে আল্লাহ দয়া ও কোমলতার সাথে কাজ নিয়ে থাকেন এবং তিনি ক্ষমাশীল।"

[সূরা নিসা ঃ ৪৩]

যেসব কারণে গোসল ফরয হয়

নিম্নোক্ত কারণে গোসল ফরয হয়ে পড়ে ঃ

১. হায়েযের রক্ত থেকে পবিত্র হবার জন্য।

www.bjilibrary.com

২. সন্তান প্রসব করার পর (রক্ত নির্গত না হলেও) নিফাস কাল শেষ হলে।

৩. মৃত্যু হলে (তবে মৃত ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে)।

৪. কাফির অবস্থা থেকে ইসলাম গ্রহণ করলে (যদি অপবিত্র হয়ে থাকে)।

৫. 'জানাবত' থেকে পবিত্র হবার জন্য।

সন্তান প্রসব করলে গোসল ফরয হয়। এমনকি প্রসবকালে যদি রক্ত নির্গত নাও হয়। এটাই সকল ফকীহর সাধারণ মত। তবে, হাম্বলী ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন। তাঁদের মতে প্রসবকালে রক্ত নির্গত না হলে গোসল ফরয হয়না।

দু'টি কারণে 'জানাবতের' অবস্থা সৃষ্টি হয়। এক, স্ত্রী সংগম করলে (বীর্যপাত না হলেও)। দুই, সুখানুভূতির সাথে বীর্যপাত হলে, চাই স্বপ্নদোষের কারণে হোক, চুমু বা স্পর্শের কারণে হোক, দেখা বা ধারণা করার কারণে হোক কিংবা এরূপ অন্য যে কোনো কারণেই বীর্যপাত হোকনা কেন, তাতে জানাবত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং গোসল ফরয হয়। গোসল ফরয হবার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়ই সমান।

ইতিপূর্বে এ হাদীসটি উল্লেখ করে এসেছি যে, হযরত উম্মে সুলাইম (রা) নবী করীমের (সা) খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা করেন না, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের জন্য গোসল ফরয হয়?" জবাবে নবী করীম (সা) বললেনঃ "হাঁ, বীর্য নির্গত হলে গোসল ফরয হয়।" একথা শুনে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? এতে নবী করীম (সা) বললেন "তোমার হাতে মাটি লাগুক, তাই যদি না হবে, তাহলে সন্তান মায়ের মতো হয় কেন?"

নবী করীম (সা) কিভাবে গোসল করতেন?

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) যখন গোসল করতেন, প্রথমে স্বীয় দু'হাত ধুইয়ে নিতেন।

www.bjilibrary.com

তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান ধুইয়ে নিতেন। অতপর নামাযের অযুর মতো অযু করে নিতেন। এরপর অঞ্জলিতে করে পানি নিয়ে ভিজা আঙ্গুল চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌছাতেন। যখন অনুভব করতেন, চুল ভিজেছে তখন মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন। অতপর সারা শরীরে পানি ছড়িয়ে দিতেন।

বুখারী এবং মুসলিমের অপর একটি বর্ণনাতে আছে আংগুল দিয়ে চুল খিলাল করতেন। যখন অনুভব করতেন যে, চুলের গোড়ার চামড়া ভিজে গেছে, তখন উপর থেকে তিনবার পানি ঢালতেন।

বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস আছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) যখন ফরয গোসল করতেন, তখন পানির পাত্র চেয়ে নিতেন। তা থেকে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পাশ অতপর বাম পাশ ধইয়ে নিতেন। এরপর স্বীয় দু' অঞ্জলি দিয়ে মাথায় পানি ঢালতেন।

সিহা সিত্তার গ্রন্থাবলীতে উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, আমি একবার নবী করীমের (সা) গোসলের জন্য পানি এনে দিই। আমি দেখেছি, তিনি নিজের ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি নিয়ে উভয় হাত দুই বা তিনবার ধুয়েছেন। অতপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি নিয়ে স্বীয় লজ্জাস্থান ধুইয়েছেন। এরপর হাত যমীনে ঘষেছেন। কুল্লী করেছেন। নাক ধুইয়েছেন। মুখমন্ডল এবং দুই হাত ধু'য়েছেন অতপর তিনবার মাথা ধুইয়েছেন এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিয়েছেন। এরপর সেই স্থান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দুই পা ধুইয়েছেন। মাইমূনা (রা) বলেন, আমি তাঁকে রুমাল এগিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। বরং দু' হাতে পানি মুছতে লাগলেন।

মহিলাদের গোসলের নিয়ম

পুরুষ এবং মহিলাদের গোসলের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য মহিলাদের খোঁপা ও বেনীর ব্যাপারে কথা হলো, গোসলের সময় এগুলো খোলা জরুরী নয়। তবে শর্ত হলো, চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছুতে হবে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ মহিলাদের জানাবতের গোসল এবং হায়েয নিফাসের গোসলের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে জানাবতের গোসলের জন্য খোঁপা-বেনী খোলা ওয়াজিব নয়। তবে, হায়েয নিফাসের অবস্থা থেকে পবিত্র হবার গোসলে খোঁপা বেনী খোলা ওয়াজিব।

ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম তিরমিযী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, জনৈক মহিলা নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি আমার মাথার চুলের খোঁপা বেঁধে থাকি। গোসলের সময় খোঁপা খোলা কি জরুরী?" জবাবে নবী করীম (সা) বললেনঃ "মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দেবে, যা গোটা শরীরে বইয়ে যাবে। বাস্ পবিত্র হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।"

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হায়েযের পর গোসল করার ব্যাপারে নবী করীম (সা) নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "চুল খুলে নাও এবং গোসল করো।" ইবনে মাজাহ সহীহ সনদের সাথে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা জানতে পারলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মহিলাদের গোসলের সময় খোঁপা খোলার নির্দেশ দিচ্ছেন। ঘটনা শুনে, তিনি বললেন, আশ্চর্য! ইবনে উমার (রা) গোসলের সময় মহিলাদের চুল খোলা জরুরী ঘোষণা করছেন। তিনি গোসলের সময় মহিলাদের চুল কামিয়ে নেবার নির্দেশ দিলেই তো পারতেন। অথচ আমি এবং নবী করীম (সা) একই পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করতাম। আমি শুধু মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতামনা।" হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।

মহিলাদের উচিত, হায়েয এবং নিফাসের গোসল করার সময় তুলা বা অনুরূপ কিছুর মধ্যে আতর লাগিয়ে যেসব স্থানে সাধারণত রক্ত লাগে সেসব স্থানে লাগিয়ে দেয়া। এতে করে রক্তের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে এবং শরীর সুগন্ধময় হবে।

www.bjilibrary.com

তিরমিযী ছাড়া সিহা সিত্তাহর বাকী পাঁচটি গ্রন্থে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) নবী করীমের (সা) নিকট হায়েযের গোসল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন ঃ

"মহিলাদের কর্তব্য হলো ঃ প্রথমে পানি এবং কুল পাতা দিয়ে নিজেদেরকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করে নেবে। অতপর মাথার উপর পানি ঢেলে ভালভাবে ঘষে-মথে নেবে, যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। এরপর মাথার উপর পানি ঢেলে গোটা শরীর ধুইয়ে নেবে। অতপর তুলা প্রভৃতিতে সুগন্ধি মেখে নিয়ে তা দিয়ে নিজেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে নেবে।"

আসমা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা দিয়ে কিভাবে পবিত্র হবো? নবী করীম (সা) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ, যাও, তা দিয়ে নিজেকে পবিত্র করে নাও। অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রা) আসমাকে কানে কানে বললেন ঃ "সুগন্ধিযুক্ত তুলা সেসব স্থানে লাগাবে, যেখানে যেখানে রক্তের দাগ লাগে।" অতপর আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাবতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ

"প্রথমে পানি নিয়ে ভালভাবে ধুইয়ে নাও এবং নিজেকে ভালভাবে পরিচ্ছন্ন করে নাও। এরপর মাথায় পানি ঢেলে ঘষে-মথে ভালভাবে চুলের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে নাও। অতপর গোটা শরীরে পানি ঢেলে দাও।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আনসার মহিলারা কতইনা উত্তম। দীনের বিধান বুঝে নেবার ব্যাপারে লজ্জা তাদের কাছে প্রতিবন্ধক হয়না। আর নবী করীম (সা) যে বলেছেন ঃ "নিজেকে ভালভাবে পরিচ্ছন্ন করে নাও" তার অর্থ অযু। অর্থাৎ ভালভাবে অযু করে নাও।

গোসলের আরকান

গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে যেসব কথা এসেছে, এতক্ষণ সেগুলো আলোচিত হলো। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, শরীয়তসম্মত গোসল দু'টি জিনিস ছাড়া পূর্ণ হয়না। এর মধ্যে একটি হলো নিয়্যত আর অপরটি হলো, গোটা শরীর পাক পানি দিয়ে ধুইতে হবে।

www.bjilibrary.com

ক. নিয়্যত ঃ হানাফীরা ছাড়া অন্যান্য ফকীহগণ নিয়্যতকে গোসলের একটি রুকন (স্তম্ভ) গণ্য করেছেন। কারণ নিয়্যত দ্বারাই অভ্যাস এবং ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে।

নিয়্যত মূলত অন্তরের কাজ। তাই, মনে মনে নিয়্যত করাই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি মুখে উচ্চারণ করে যে, আমি জানাবত থেকে পবিত্র হবার জন্য গোসল করছি, তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নাই।

প্রথম অংগে পানি লাগাবার সময়ই নিয়্যত করা জরুরী। কিন্তু এর কিছু পূর্বে নিয়্যত করলেও অসুবিধা নেই। হানাফীদের মতে, নিয়্যত গোসলের সুন্নাত, রুকন নয়।

খ. পুরো শরীর ধোয়া ঃ গোসল বিশুদ্ধ হবার জন্য পুরো শরীর একবার পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। কষ্ট বা ওযর ছাড়া যতো দূর পানি পৌছানো যায়, পৌছাতে হবে। এ বিষয়ে নিম্নে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা গেলো।

গোসলের অযু কিভাবে করবেন?

গোসল বিশুদ্ধ হবার জন্য শর্ত হলো, গোসল যিনি করবেন, তিনি গোসলের আগে অযুর সকল রুকন ও ফরয আদায় করে পূর্ণাঙ্গ অযু করে নেবেন। যেমন নিয়্যত করবেন। পূর্ণ মুখমণ্ডল ধুইবেন। কনুই পর্যন্ত দু' হাত ধুইবেন। মাথা মাসেহ করবেন। টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধুইবেন। এগুলো ধুইবার সময় পরম্পরা ঠিক রাখবেন। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর দুই হাত, তারপর মাথা মাসেহ এবং এরপর দুই পা ধুইবেন। বিরতিহীনভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অযু করবেন। অর্থাৎ একটি অংগ ধুইয়ে রেখে দিলেন বা অন্য কোনো কাজ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর পরবর্তী অংগ ধুইলেন, এমনটি করবেনা।

অধিকাংশ হানাফী আলিমের মত হলো, গোসলকারী অযু করার সময় পা ছাড়া আর সকল অংগ ধুইবেন এবং মাসেহ করবেন। এরপর গায়ে পানি ঢালবেন এবং তার পর পা ধুইবেন। উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা (রা) এভাবেই নবী করীম (সা) গোসল করতেন বলে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু কিছু কিছু হানাফী আলিমের মত হলো, পা ধুইবার কাজটিও প্রথমে অযু করার সময়ই সারতে হবে, যাতে করে অযু পূর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোসল করার ধরন সংক্রান্ত হাদীসটিকে যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। 'হেদায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "অতপর নামাযের অযুর মতো অযু করবে। তবে এ সময় পা ধুইবে না। বরং পরে ধুইবে। কিন্তু যদি কোনো উঁচু কাঠের উপর বসে অযু করে তবে পা তখনই ধুইবে, দেরী করবে না।"

'আল বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ মতভেদ পা আগে কিংবা পরে ধোয়া জায়েয বা নাজায়েযের ব্যাপারে নয়। বরঞ্চ মতভেদ হলো এই নিয়ে যে, পা আগে ধোয়া উত্তম না পরে ধোয়া?

শাফেয়ী মযহাবেও দুই রকমই জায়েয। তবে মতভেদ হলো, দুই রকমের কোন্ রকম উত্তম? অবশ্য দু'ভাবেই সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

পশমের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছানো

জানাবতের গোসলে সারা শরীর পানি দিয়ে ভিজানো ফরয। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। এ বিষয়ে দলীল হলো হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি জানাবতের গোসল করার সময় একটি পশমের পরিমাণ স্থানও পানি দিয়ে ভিজানো থেকে বাদ দিলো, আল্লাহ তাআলা তাকে এভাবে এভাবে আগুন দিয়ে শাস্তি দেবেন।" [মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ]

হায়েয ও নিফাসের গোসল জানাবতের গোসলের মতই করতে হয়।

বিভিন্ন মযহাবের দৃষ্টিকোণ

হানাফীদের মতে, গোসলের সময় যদি কোনো মহিলার খোঁপা বাঁধা থাকে এবং সেই অবস্থায় পানি যদি চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে খোঁপা খোলা জরুরী নয়। অবশ্য খোঁপা বা বেণী পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া ওয়াজিব। আর যদি খোঁপা বা বেণী ঠাসা করে বাঁধা না থাকে, তবে চুলের উপরে এবং গোড়ায় অর্থাৎ বাইরে-ভেতরে সর্বত্র পানি পৌঁছানো

www.bjilibrary.com

ওয়াজিব। কোনো মহিলার মাথায় যদি সুগন্ধি প্রভৃতি কোনো কিছুর এমন পালিশ লাগানো থাকে যা চুলের গোড়ায় পানি পৌছানোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে গোসলের পূর্বে পালিশ উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব।

হাম্বলী মযহাবে হায়েয ও নিফাসের গোসলে খোঁপা ও বেণী খোলা ওয়াজিব। কিন্তু জানাবতের গোসলে খোলা ওয়াজিব নয়। কেননা, বার বার এগুলো খোলা একটা কষ্টকর ব্যাপার। হায়েয–নিফাসের ক্ষেত্রে কষ্টকর নয়, কেননা, সে ক্ষেত্রে অনেক দিন পর একবার খুললেই চলে।

শাফেয়ী ফকীহদের মতে চুল ঘন হোক কিংবা পাতলা, গোসলের সময় চুলের আগা গোড়া সবদিক ভালভাবে ধোয়া ওয়াজিব। বেঁধে রাখা চুল না খুলে গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছানো যদি সম্ভব না হয়, তবে খোলা ওয়াজিব। এ মাসআলার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। তবে কারো চুল যদি প্রকৃতিগতভাবেই কোঁকড়া হয়ে থাকে এবং সে কারণে সর্বত্র পানি পৌছানো কষ্টকর হয়, তবে এরূপ চুলের ক্ষেত্রে এই বিধান কার্যকর হবে না এবং এরূপ চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো ওয়াজিব নয়।

মালিকী মযহাবের মতে চুলের গোড়ার চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছানো ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে চুলের অবস্থা যাই হোকনা কেন তাতে কিছু যায় আসেনা। অর্থাৎ চুল ঘন হোক, পাতলা হোক, খোলা হোক কিংবা বেঁধে রাখা হোক সর্বাবস্থায়ই চামড়ায় পানি পৌছাতে হবে। খোঁপা যদি খুব ঠাঁসা করে বাঁধা হয়ে থাকে, তবে তা খোলা ওয়াজিব। খুব ঠাঁসা করে বাঁধা না হয়ে থাকলে খোলা ওয়াজিব নয়, কেবল নেড়েচেড়ে গোড়ায় পানি পৌছে দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তিন বা ততোধিক বেণীতে যদি বাঁধা হয়ে থাকে, তবে খোলা ওয়াজিব।

মালিকী মযহাবের উত্তরসূরী ফকীহগণ এই বিধান থেকে এমন নববধূকে অব্যহতি দিয়েছেন, যে তৈল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্বারা চুলকে সুরভিত করে রেখেছে। তাদের মতে এমন নববধূর জন্য মাথা ধোয়া ফরয নয়। মাথা মাসেহ করে নেয়াই তার জন্য যথেষ্ট। কেননা, এমতাবস্থায় মাথা ধুইলে সম্পদ বিনষ্ট হয়। নববধূটি যদি তার পুরো শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে থাকে, তবে তায়াম্মুম করে নেয়াই যথেষ্ট।[১]

১. সূত্র ঃ আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, পৃঃ ৬০, দারুল শিরাব সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

এই অবকাশ শুধুমাত্র নববধূর জন্য। শুধুমাত্র জানাবতের গোসলের জন্য। ততোদিনের জন্য যতোদিন একজন মহিলা সাধারণত নববধূ থাকে। এর কারণ হলো, মহিলারা প্রকৃতিগতভাবে এই সময়টাতে ভাল সাজসজ্জা করে থাকে। সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকে। এই প্রবণতা নববধূ থাকাকালে তাদের মধ্যে বেশী থাকে। তাই এ সময়টাকে জটিলতা মুক্ত করা ও সম্পদহানি থেকে বাঁচার জন্য তার গোসলে মাথা মাসেহর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সহজতা বিধান। কষ্ট ও জটিলতা দূর করা। যেমন, শরীয়ত মা'যূর লোকদের ইবাদতের ক্ষেত্রে সহজতা দান করেছে। যেমন, মোজা পরিধানকারী, আঘাতের স্থানে ব্যান্ডিজ বন্ধনকারী, ভাংগা হাড় জোড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে প্লাস্টার ব্যবহারকারীদের জন্য ধোয়ার পরিবর্তে মাসেহ জায়েয করা হয়েছে। এর দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ দীনের মধ্যে তোমাদের জন্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" [আল-হজ্জ ঃ ৭৮]

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - (البقره : ١٨٥)

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ সহজতা বিধান করতে চান, কঠোরতা নয়।" [আল বাকারা ঃ ১৮৫]

তবে মনে রাখতে হবে, এই ব্যতিক্রম প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একটি অবকাশ মাত্র। প্রয়োজনকে কেবলমাত্র প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে।[১]

আমাদের বক্তব্য হলো, মালিকী মযহাবের পরবর্তী এই ফকীহগণ নববধূর জানাবতের গোসলের ক্ষেত্রে মাথা মাসেহ এবং তাইয়াম্মুমের অবকাশ সবলিত এই যে ফতোয়া দিয়েছেন, তার সাথে আমরা একমত হতে পারি না। কেননা, তারা যে দলীলের আশ্রয় নিয়েছেন তা এ ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে দুর্বলতা আছে। দ্বিতীয়ত, এই মত অল্প কয়েক জন আলিমের মাত্র। অধিকাংশ আলিমগণের মতামত এর বিপরীত।

---

১. মুফতী আল্লামা আল শাইখ মুহাম্মদ মখলুফ ঃ ফাতাওয়া শরয়ীয়া ওয়া বহুসুল ইসলামিয়া, ১ম খণ্ড, ২২-২৪ পৃষ্ঠা এবং আলফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া।

www.bjilibrary.com

সর্বত্র পানি পৌঁছানো

সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গোটা শরীরের যতোদূর পানি পৌঁছানো যায়, ততোদূর পর্যন্ত একবার পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এর অর্থ হলো, শরীরের কোনো অংশে যদি পানি না পৌঁছে থাকে, তা যতোই ক্ষুদ্রাংশ হোক না কেন, গোসল বিশুদ্ধ হবেনা। এ জন্য শরীরের গোপন-প্রকাশ্য সর্বত্র পানি পৌঁছে দেয়া জরুরী, যেমন নাভীর ছিদ্র, কিংবা শুকিয়ে যাওয়া আহত স্থানের গর্ত ইত্যাদি। অবশ্য এ ধরনের স্থানে নল লাগিয়ে পানি পৌঁছানো জরুরী নয়। কিন্তু শরীরে লেগে থাকা এমন প্রতিটি জিনিস উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব যা শরীরে পানি পৌঁছাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। হাতে কোনো সংকীর্ণ আংটি থাকলে তার অভ্যন্তরে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব।

এ আলোচনা থেকে এ কথাও পরিষ্কার হলো যে, নখে নখ পালিশ লাগিয়ে রাখা অবস্থায় গোসল বিশুদ্ধ হবেনা। মালিকী মযহাবে বৈধ ধরনের আংটি সংকীর্ণ হলে তা না খুলে গোসল করা জায়েয। গোসলের সময় মেয়েদের অলংকার খুলে ফেলাও জরুরী নয়।

কানফুলের বিধান

গোসলের সময় মহিলাদের কানে কানফুল থাকলে তা নেড়েচেড়ে নেয়া জরুরী, যাতে করে কানফুল পরা ছিদ্রে পানি পৌঁছে যায়। কানে ছিদ্র করা আছে অথচ কানফুল পরা নেই এমন ছিদ্রেও পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো পানি স্বাভাবিকভাবে পৌঁছতে হবে। জোর করে ঢুকানোর প্রয়োজন নেই। এ হচ্ছে হানাফীদের মত।

শাফেয়ীদের মতে কানফুলের ছিদ্রে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। কেননা, তাদের মতে কেবল শরীরের বাইরের অংশ ধোয়াই ওয়াজিব, ভেতরের অংশ নয়।

মালেকীদের মতে কান বা নাকে যদি এমন অলংকার পরা থাকে, যা পরা বৈধ, যেমন সোনা-রূপার অলংকার, তবে ছিদ্রের ভেতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি লোহা, তামা বা পিতলের অলংকার

www.bjilibrary.com

হয় এবং তা গোশতের সাথে লেগে থাকে, তবে তা নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেয়া ওয়াজিব, যাতে করে ভেতরে পানি ঢোকে। আর যদি কান বা নাকে ছিদ্র করা থাকে কিন্তু অলংকার পরা না থাকে তবে তাতে পানি পৌছানো ওয়াজিব।

গোসলের সুন্নাত ও মুস্তাহাব

গোসলের সুন্নাত ও মুস্তাহাবের সংখ্যা অনেক। আবার বিভিন্ন মযহাবে এগুলোর ব্যাপারে মততেদও আছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। যেসব ফিক্‌হের গ্রন্থে বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, উৎসুক পাঠকগণকে সেগুলো পাঠ করার অনুরোধ করছি।

এখনে গোসলের জরুরী সুন্নাত এবং মুস্তাহাবগুলো আলোচনা করা গেলো ঃ

১. নিয়্যত করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া। অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে গোসল আরম্ভ করা।

২. গোসল সংক্রান্ত বিভিন্ন দোয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে, যেগুলো অযু করবার সময় পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু গোসলের সময় দোয়া পড়া মুস্তাহাব নয়। কারণ, গোসলের স্থান দিয়ে সাধারণত অপবিত্র পানি বয়ে যায় অথচ আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী হলো সেগুলো অপবিত্র স্থানে উচ্চারণ না করা। যেমন পায়খানা প্রভৃতি স্থান।

৩. ঢেকে রাখার অংগগুলো ঢেকে রাখা ঃ শাফেয়ীদের মতে (একান্ত নির্জনে হলেও) গোসল করার সময় সতরের স্থানসমূহ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু লজ্জাস্থানকে মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখা ওয়াজিব। উন্মুক্ত করা হারাম। এ ব্যাপারে প্রমাণ আছে এবং ইজমাও হয়েছে। প্রমাণ হলো, একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বীয় দেহের সতর করার অংগসমূহ জনসমুখে লুকিয়ে রাখে না, তার প্রতি অবিরাম অভিশাপ বর্ষিত হয় আল্লাহর ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের। (হাদীসটির সূত্র হলো, মুসনাদে আবু হানীফা)।

www.bjilibrary.com

এ জিনিসটি মহান দীন ইসলামের সেই সব সামাজিক শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর মাধ্যমে সে তার অনুসারীদের মধ্যে লজ্জাশীলতা সৃষ্টি করে। লজ্জাশীলতা পুরোটাই কল্যাণ। তাছাড়া এ বিধানের উদ্দেশ্য হলো ফিতনা প্রতিরোধ করা, যাতে করে মানুষের ইজ্জত আবরু নিরাপদ থাকে, সে যেন লাঞ্ছিত না হয় এবং উন্নত নৈতিক গুণাবলীর ধারক বাহক হয়।

ইসলাম মানুষের লজ্জাস্থান হেফাজতের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামে কেবল নারী পুরুষ একজন আরেকজনের সম্মুখে লজ্জা স্থান উন্মুক্ত করাকেই নিষিদ্ধ করেনি। বরঞ্চ পুরুষের সামনে পুরুষের এবং নারীর সামনে নারীর লজ্জাস্থানকে পর্যন্ত জরুরী কারণ না ঘটলে উন্মুক্ত করতে এবং দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হারাম করেছে।

নবী করীম (সা) তো প্রথম প্রথম গণস্নানাগারে যেতে সম্পূর্ণই নিষেধ করেছিলেন। পরে পুরুষদেরকে কেবল এমন বস্ত্র পরিধান করে যাবার অনুমতি দিয়েছেন, যা লজ্জাস্থানসমূহকে সুন্দরভাবে ঢেকে রাখবে। নারীদের সকল স্নানাগারে যেতে অকাট্যভাবে অনুমতি দেননি। কোনো মহিলা যদি রোগ বা সন্তান প্রসবের কারণে সেখানে যেতে বাধ্য হয়, তবে তার জন্য শর্ত হলো, শরীরের লজ্জাস্থানসমূহ সম্পূর্ণ ঢেকে যেতে হবে। এমনকি তার শরীরের এমন কোনো অংগও উন্মুক্ত থাকতে পারবেনা, যা পুরুষের দেখা হারাম।

৪. তুলা বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে রক্ত লাগা স্থানসমূহ ঘষে-মেজে ফেলাও মুস্তাহাব। তুলা বা কাপড়ের টুকরা পাওয়া না গেলে পানি দিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার করে নেবে। কিন্তু এ বিধান এমন মহিলার জন্য যে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে রাখেনি, রোযা রাখেনি কিংবা স্বামীর মৃত্যুশোক পালন করছে না।

ইতিপূর্বে এ মাসআলা সংক্রান্ত উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা) একটি হাদীস আমরা উল্লেখ করে এসেছি। হাদীসটি ছিলো হযরত আসমা (রা) বিনতে ইয়াযীদ সম্পর্কে।

www.bjilibrary.com

গোসলের আরো দু'টি মাসআলা

১. হায়েয এবং জানাবতের জন্যে এক গোসলই যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো গোসলের সময় উভয়টারই নিয়্যত করতে হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমলের ফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা পাবার জন্য সে নিয়্যত করে।

২. ঋতুবতী এবং জানাবতের গোসল ফরয হয়েছে এমন মহিলা চুল মুণ্ডন করাতে পারে, নখ কাটতে পারে, লোম পরিষ্কার করতে পারে, বাজারে যেতে পারে এবং এরূপ অন্যান্য কাজ করতে পারে। এই অবস্থায় এসব কাজ করা মাকরূহ নয়। আতা (রা) বলেছেন ঃ জানাবতের গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মানুষ রক্তমোক্ষণ করাতে পারে, নখ কাটতে পারে, চুল কাটতে পারে, মাথা কামাতে পারে। এমনকি অযু না করে থাকলেও এগুলো করতে পারে।[১]

হদছে আকবর অবস্থায় যেসব কাজ নিষেধ

হদছে আকবর মানে–জানাবত, হায়েয এবং নিফাসের অবস্থা। সন্তান প্রসবের সময় কোনো মহিলার যদি রক্ত নাও আসে, তবুও এ অবস্থা সৃষ্টি হবে।

হদছে আকবরের অবস্থায় সেই সকল কাজই নিষেধ, যা হদছে আসগরের (অযু বিধান) অবস্থায় নিষেধ। এ অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করা না করার বিষয়ে নিম্নে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১. কুরআন তিলাওয়াত

● মালেকী মযহাবে জানাবতের অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত জায়েয নয়। তবে রোগ শেফা বা আশ্রয় প্রার্থনা এবং যুক্তি প্রমাণ পেশ করার জন্য কিছু অংশ তিলওয়াত করা জায়েয। কিন্তু হায়েয এবং নিফাস অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয। এমনকি জানাবতের অবস্থায়ও যদি কারো হায়েয বা নিফাস শুরু হয়ে থাকে তার জন্যও

১. ফিক্‌হুস সুন্নাহ ঃ প্রথম খন্ড, ৭৫ পৃঃ। সংকলন শেখ সাইয়েদ সাবেক। দারুল কুতুব আরবী সংস্করণ ১৯২৯ ইং।

www.bjilibrary.com

কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ। কিন্তু রক্ত বন্ধ হবার পর জানাবত অবস্থায় থাক বা না থাক সহীহ মতানুযায়ী গোসল ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত বৈধ নয়। কারণ, রক্ত বন্ধ হবার পর গোসল করে পবিত্রতা লাভ করার অবকাশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ সময় গোসল ছাড়া তিলাওয়াত বৈধ নয়। কুরআন স্পর্শ করা বা লিখার ব্যাপারে কথা হলো, এ কাজগুলো যদি শিখা ও শিখানোর উদ্দেশ্যে হয়, তবে জায়েয নতুবা জায়েয নয়।

• হানাফী মযহাবে জানাবতের অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। তবে শিক্ষকের জন্য ছাত্রদেরকে একেকটি শব্দ পৃথক পৃথক করে পড়ানো জায়েয। জানাবত অবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয। দোয়ার উদ্দেশ্যে হামদ-ছানা হিসেবে কোনো ছোট আয়াত পড়া জায়েয। এ ক্ষেত্রে নুফাসা ও ঋতুবতীদের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য।

• শাফেয়ীদের মতে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে জানাবতের অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। এমনকি একটি শব্দও উচ্চারণ করা যাবে না। তবে যিকিরের উদ্দেশ্যে কিংবা এমনিতেই যদি উদ্দেশ্যহীনভাবে মুখে বের হয়ে আসে, তবে হারাম নয়। যিকিরের উদাহরণ হলো, খাবার সময় বিসমিল্লাহ পড়া, যানবাহনে আরোহণ করতে সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা------- প্রভৃতি পাঠ করা। যেমন জায়েয গোসল ফরয হওয়া সেই ব্যক্তির জন্যে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা, যে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার সময়ও পানি বা মাটি পায়নি।

• হাম্বলীদের মতে হদছে আকবরের অবস্থায় ওযর ছাড়া একটি ছোট আয়াতের চেয়েও ক্ষুদ্রতর আয়াতাংশ পাঠ করা জায়েয। তবে তার চাইতে বেশী হলে হারাম। তবে কুরআনের আয়াতের কোনো দোয়া বা যিকির পাঠ করা জায়েয। যেমন বিসমিল্লাহ পড়া কিংবা সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা... প্রভৃতি পাঠ করা।

www.bjilibrary.com

২. নামায এবং মসজিদে প্রবেশ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى - حَتّٰى تَعْلَمُوا مَاتَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا - (النساء : ٤٣)

"নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটে যেয়োনা। নামায তখন পড়বে, যখন তোমরা জানবে যে, কি বলছো। এভাবে জানাবত অবস্থায়ও নামাযের নিকটে যেয়ো না, যতোক্ষণ না গোসল করে নেবে। তবে ভ্রমণকারী হলে অন্য কথা।" [আন নিসা ঃ ৪৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নামাযের নিকটে যেয়ো না মানে নামায এবং নামাযের স্থানে অর্থাৎ মসজিদে যেয়োনা।

নামাযের নিকটে না যাবার অর্থ তো পরিষ্কার। এ অবস্থায় গোসল না করে নামায পড়ার প্রশ্নই উঠেনা। তবে মসজিদের নিকটে না যাওয়া বা প্রবেশ না করার বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিম্নে তাঁদের মতামত উল্লেখ করা হলো ঃ

● মালেকীদের মতে, জানাবতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা, অবস্থান করা এবং অতিক্রম করা অর্থাৎ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া এসবই নাজায়েয। এমনকি নিজ ঘরের মসজিদ হলেও। অবশ্য চোর ডাকাত, হিংস্র পশু বা অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয় থাকলে গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মজজিদে প্রবেশ করা এবং অপেক্ষা করা জায়েয। কিন্তু এ অবস্থায়ও তায়াম্মুম করে প্রবেশ করবে। গোসল করবার পানি আনার পথ যদি মসজিদের ভেতর দিয়ে থাকে, কুয়ো থেকে পানি উঠানোর জিনিসপত্র যদি মসজদিের ভেতরে থেকে থাকে এবং ঘরে যদি মসজিদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। মোট কথা, জরুরী প্রয়োজনে জানাবত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা ছাড়া যদি কারো উপায় না থাকে, তবে তিনি তায়াম্মুম করে প্রবেশ করবেন।

● হানাফী মযহাবের মত হলো, জানাবত, হায়েয ও নিফাসওয়ালীর জন্য জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। অবশ্য কোনো

www.bjilibrary.com

ওযর বা বাধ্যবাধকতা থাকলে অন্য কথা। যেমন গোসলের জন্য যদি মসজিদের বাইরে পানি পাওয়া না যায়, কিংবা ঘরের দরজা যদি মসজিদের ভেতর দিয়ে হয়ে থাকে তা যদি পরিবর্তন করা না যায় এবং তার পক্ষে যদি অন্যত্র অবস্থান করাও সম্ভব না হয়, তবে এ ধরনের সকল জরুরী অবস্থায় মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয।

এসব বিষয়ে মসজিদের ছাদের হুকুম মসজিদের ভেতরের মতোই। তবে গোসল ফরয হওয়া (জুনুবী) ব্যক্তির জন্য মসজিদের বাউণ্ডারিতে প্রবেশ করা বৈধ।

• শাফেয়ী মযহাবের মতে, জুনুবী, ঋতুবতী এবং নুফাসাদের জন্য মসজিদ অতিক্রম করা জায়েয। কিন্তু মসজিদে অবস্থান করা এবং বার বার আসা যাওয়া করা জায়েয নয়। এ অনুমতিও কেবল সে অবস্থার জন্য যখন মসজিদে তার শরীর থেকে কোনো নাপাক জিনিস পড়বার আশংকা না থাকে। কেউ যদি মসজিদের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়, তবে তা জায়েয। কিন্তু কেউ যদি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আবার সেই দরজা দিয়েই বের হয়ে আসে তবে তা হারাম।

• হাম্বলী মযহাবের মতে, জুনুবী, ঋতুবতী এবং নুফাসার জন্য মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা এবং অবস্থান না করে বার বার আসা যাওয়া করা জায়েয। এমনকি রক্ত নির্গত হবার সময়ও অতিক্রম করা জায়েয। তবে শর্ত হলো মসজিদে রক্ত বা না-পাক জিনিস পড়তে পারবেনা। ঋতুবতী এবং নুফাসা কেবল তখনই মসজিদে অবস্থান করতে পারবে, যখন রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

৩. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা

মহিলাদের জন্য মাসিক এবং নিফাসকালে রোযার নিয়্যত করা এবং রোযা রাখা হারাম। কেউ যদি এমতাবস্থায় রোযা রাখে তবে তার রোযা হবে না।

মাসিক এবং নিফাসের কারণে যে রোযা ছুটে যায়, সেগুলো কাযা (পূর্ণ) করা ফরয। তবে নামায ছুটে গেলে কাযা করা ফরয নয়। কেননা,

www.bjilibrary.com

নামায দৈনিক পাঁচবার পড়তে হয়, তাই তা কাযা (পূর্ণ) করা কষ্টকর। ইসলাম মানুষকে কষ্টে ফেলতে চায়না। আর রোযা যেহেতু দৈনিক একটি, তাই তা কাযা করা কষ্টকর নয়।

হযরত মুআযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী কারণে ঋতুবতীর রোযার কাযা দিতে হয় আর নামাযের কাযা দিতে হয়না? তিনি বললেন, তুমি খারেজী নয়তো? আমি বললাম, না। আমি শুধু এর কারণ জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, কারণ কিছু নয়। বাস্, আমাদেরকে ঋতুকালীন রোযার কাযা দিতে হুকুম করা হয়েছে আর নামাযের কাযা দিতে হুকুম করা হয়নি। [মুসলিম]

বুখারীতে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাচ্ছিলেন। মহিলাদের কাছে দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি বললেন ঃ

يا معشر النساء تصدقن فانى اريتكن اكثر اهل النار –

"হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা দাও। কারণ, (মেরাজের রাতে) আমাকে দেখানো হয়েছে, দোযখে তোমাদের সংখ্যা অধিক।"

মহিলারা নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এমনটি কেন? তিনি বললেন ঃ

تكثرن اللعن وتكفرن العشير – مارايت من ناقصات عقل

ودين اذهب للب الرجل الحازم من احد اكن –

"তোমরা অধিক অধিক অভিশাপ দিয়ে থাকো। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। একজন সতর্ক সচেতন ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের চাইতে অধিক ত্রুটিপূর্ণ দীন ও বুদ্ধির অধিকারী দেখিনি।"

মহিলারা নিবেদন করলো, ওগো আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে দীন ও বুদ্ধির কি কমতি আছে? তিনি বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয় কি?" তারা বললো ঃ হ্যাঁ, তাই? তিনি বললেন ঃ

فذلك نقصان عقلها – اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم

"এটাই তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ। তোমাদের যখন মাসিক হয়, তখন কি এমন হয়না যে, তোমরা নামায পড় না এবং রোযাও রাখ না?"

তারা বললো ঃ সঠিক, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন ঃ "এটাই নারীদের দীনের ত্রুটি।"

৪. হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ – (الطلاق : ١)

"হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তাদেরকে ইদ্দতের জন্য তালাক দেবে।"

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তালাক তখনই দিতে হবে, যখন স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হয় এবং তার সাথে সহবাস করা না হয়ে থাকে।

ফকীহগণ এ আয়াত থেকে বিধান নির্ণয় করেছেন যে, তালাক শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ সুন্নাত মুতাবেক হবার জন্য এই শর্তগুলো অনুসৃত হওয়া জরুরী ঃ

১. একবারে এক তালাক দেবে।

২. তালাক সেই তুহুরে দিতে হবে, যে তুহুরে সহবাস করা হয়নি।

৩. তালাক তখন দিতে হবে, যখন তালাক দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

www.bjilibrary.com

স্বামী যদি এসব শর্তের তোয়াক্কা না করে একইবারে একাধিক তালাক দিয়ে দেয়, কিংবা মাসিক চলাকালে তালাক দেয়, অথবা যদি সহবাস করা তুহুরে তালাক দেয়, কিংবা যদি অপরিহার্য হয়ে পড়া ছাড়াই তালাক দিলো, তবে সে সুন্নাতের বিপরীত কাজ করলো। এ ধরনের তালাককে 'তালাকে বিদআত' বলা হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে 'তালাকে বিদআত' প্রদান করে অর্থাৎ যদি হায়েয-নিফাস চলাকালে তালাক দেয়, কিংবা যদি সেই তুহুরে তালাক দেয়, যাতে বা যার পূর্বের হায়েযের সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের তালাক কার্যকর হবে কি? —এ প্রসঙ্গে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। নিম্নে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা গেলো ঃ

অধিকাংশ ফকীহর মতে এমাতবস্থায় তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

শীয়া ইমামিয়া, ইমাম ইবনে হাযম যাহেরী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনে কাইয়্যেমের মত হলো, এ ধরনের তালাক কার্যকর হয়না। এই শেষোক্ত ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, এ ধরনের তালাক দানকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে। তবে এটা পরকালের ব্যাপার, পার্থিব বিধানে এ ধরনের তালাকের কোনো কার্যকারিতা নেই।

প্রথম দলের ফকীহরা, যারা মনে করেন এরূপ তালাকদাতা সুন্নতের খেলাফ কাজ করছে, তাদের মতে এরূপ তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তারা যুক্তি গ্রহণ করেছেন হযরত ইবনে উমরের সেই হাদীসটি থেকে যার সারমর্ম হলো ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতু চলাকালে তালাক দেন। হযরত উমার (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালে তিনি বলেন ঃ তাকে আদেশ করো সে যেনো আরো তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বাণী থেকে বুঝা গেলো, যে তালাকটি দেয়া হয়েছে সেটি কার্যকর হয়েছে।

এ প্রসংগে অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (সা) বলেছি-লেন ঃ 'এক তালাক কার্যকর হয়েছে।' অপর হাদীস থেকে জানা যায় উমার (রা) নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি এটাকে এক তালাক গণ্য করেন?' তিনি জবাব দেন ঃ 'হাঁ'।

www.bjilibrary.com

সুতরাং এই হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, এ ধরনের তালাক কার্যকর হয়ে যায়। কেননা, নবী করীম (সা) ওটাকে তালাক গণ্য করেছিলেন।[১]

এ যাবত যা কিছু আলোচিত হলো, তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পুরুষের জন্য স্ত্রীকে হায়েয বা নিফাস চলাকালে তালাক প্রদান করা হারাম করা হয়েছে। কেননা, এতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। তাই এ পদ্ধতিতে তালাক দেয়া নারীদের জন্য কষ্টকর। কিন্তু এই পদ্ধতি হারাম হওয়া সত্ত্বেও এ পন্থায় তালাক দিলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন এ পন্থায় তালাক না দেয়। কেননা, এ পন্থায় তালাক দেয়া সুন্নাতের খেলাফ এবং সে কারণে হারাম।

৫. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় অন্যান্য মাসআলা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলো ঃ 'ঋতুকালে আমার স্ত্রীর সাথে কিছু করা কি জায়েয?' তিনি জবাব দেন ঃ "তার পায়জামার রশি শক্ত করে বেঁধে নাও। তারপর উপরিভাগে যা চাও করতে পারো।"

মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঋতুকালে আমার স্ত্রীর সাথে কিছু করা কি জায়েয?' উম্মুল মুমিনীন জবাব দেন ঃ 'সহবাস ছাড়া সবই করতে পারো।'

শাফেয়ী এবং হানাফীদের মতে, হায়েয এবং নিফাস চলাকালে স্ত্রীর নাভী এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী কোনো স্থানে বস্ত্রহীন অবস্থায় সুখ লাভ করা হারাম। অবশ্য মাঝখানে কোনো বস্ত্রের আড়াল থাকলে জায়েয। কিন্তু সহবাস জায়েয নয়। এমনকি মাঝখানে কোনো বস্ত্রের আড়াল থাকলেও সহবাস জায়েয নয়। অর্থাৎ যে কোনো ধরনের আবরণ ব্যবহার করেও সহবাস জায়েয নয়। সুতরাং এ ধরনের কাজ কেউ করলে গুনাহগার হবে। তার উচিত এক দীনার বা অর্ধ দীনার সদকা করা।

মালেকী মযহাবে দেহের হাঁটু এবং নাভীর মধ্যবর্তী যে কোনো স্থান থেকে সহবাসের মাধ্যমে স্বাদ আস্বাদন করা অকাট্যভাবে নাজায়েয।

---

১. বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ 'আল আহওয়ালুস শখসিয়া ফীশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া' দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৫–২৯৬। গ্রন্থকার ঃ ডঃ মাহমুদ মুস্তফা তানতাবী।

www.bjilibrary.com

তবে, সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করার ক্ষেত্রে এ মযহাবে দু'টি মত রয়েছে। যে মতটি খ্যাতি–লাভ করেছে, তা হলো সহবাস তো নয়ই, অন্যকিছু করাও জায়েয নয়, মাঝখানে কোনো আবরণ থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসেনা। অপর মতটি হলো সহবাস ছাড়া অন্য সব কিছুই জায়েয। এমনকি মাঝখানে আড়াল বা আবরণ থাক বা না থাক তাতেও কিছু যায় আসে না।

হাম্বলী মযহাবে হায়েয ও নিফাস চলাকালে নাভী এবং হাটুর মধ্যবর্তী কোনো স্থান থেকে স্বাদ উপভোগ করা বস্ত্র বা আবরণহীন অবস্থায়ও জায়েয। তবে যে জিনিসটি নিষিদ্ধ তা হলো হায়েয অবস্থায় সহবাস করা। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এমন কিছু করে বসে তবে তার উপর তওবা করা ওয়াজিব। তাছাড়া কাফফারা দেয়াও তার উচিত। অর্থাৎ সামর্থ থাকলে এক দীনার বা অর্ধ দীনার সদকা করবে। কিন্তু সামর্থ না থাকলে কাফফারা প্রদান রহিত হয়ে যাবে।

৬. হায়েয নিফাস চলাকালে ই'তেকাফ করা

হায়েয নিফাস চলাকালে ই'তেকাফ করা জায়েয নয়। 'রোযা' অধ্যায়ে মহিলাদের ই'তেকাফ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

৭. হায়েয নিফাস চলাকালে সহবাস

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ، وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ، فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ - (البقره : ٢٢٢)

"ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো। তাদের নিকটে যেয়োনা, যতোক্ষণ না তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়। অতপর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকটে যাও, সেভাবে, যেভাবে যেতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ করেছেন।" [আল বাকারা : ২২২]

আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশের আলোকে পবিত্র হবার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা পুরুষের জন্য হারাম। আর পবিত্রতা লাভ হয়

www.bjilibrary.com

গোসলের মাধ্যমে কিংবা গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুমের মাধ্যমে।

মোট কথা, কুরআন, সুন্নাতে রাসূল এবং ইজমার দৃষ্টিতে হায়েয নিফাস চলাকালে স্ত্রী সহবাস করা হারাম। কুরআন থেকে তো প্রমাণ পেশ করা হয়েছেই। হাদীসের প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'সহবাস ছাড়া সবকিছু করতে পারো।'

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী লিখেছেন, কোনো মুসলমান যদি এ আকীদা পোষণ করে যে, ঋতুবতীর সাথে সহবাস করা জায়েয, তবে সে কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি এই অবস্থায় সহবাস করাকে বৈধ মনে করে না ঠিক, কিন্তু ভুলবশত সহবাস করে বসলো, অথবা তার যদি জানাই না থাকে যে, ঋতুকালে সহবাস করা হারাম, কিংবা স্ত্রীর যে হায়েয আরম্ভ হয়েছে, স্বামী যদি টের না পায় এবং সহবাস করে বসে, তবে এসব অবস্থায় সে গুনাহগার হবে না এবং কাফফারা প্রদান করাও জরুরী নয়।

কিন্তু যদি জেনে বুঝে সহবাস করে অর্থাৎ যদি তার জানা থাকে যে, মাসিক শুরু হয়েছে, যদি তার জানা থাকে যে, এমতাবস্থায় সহবাস করা হারাম এবং এরূপ অবস্থায় সহবাস করাটা গুনাহ, তবে সে কবীরা গুনাহে নিপতিত হবে এবং এই গুনাহ থেকে তওবা করা তার জন্য ওয়াজিব।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী হলো 'পৃথক থাকো'। এটি আল্লাহর নির্দেশ। আর তাঁর নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য। এখানে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ঋতুকালে ঋতুর বিশেষ অংগ থেকে দূরে থাকো। তাই কেউ এই অবস্থায় সহবাস করলে সেটা হবে হারাম কাজ। কারণ, 'পৃথক থাকো' বলার পর আল্লাহ তাআলা আরো পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ –

"তাদের নিকটে যেয়োনা, যতোক্ষণ না তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়। অতপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের কাছে গমন করো।

[বাকারা ঃ ২২২]

www.bjilibrary.com

প্রসঙ্গক্রমে কুরআন এর কারণও বলে দিয়েছে এই ভাষায় যে, 'হুয়া আযা'–'এটা নোংরা ও কষ্টকর অবস্থা'। সুস্থ স্বভাবের মানুষ এ অবস্থাকে ঘৃণা না করে পারেনা।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ঋতুকালে সহবাসকারীর সন্তান কুষ্ঠরোগী হয়।

ইমাম গাযালী লিখেছেন, হায়েয চলাকালেও সহবাস করা উচিত নয় এবং হায়েয বন্ধ হবার পর গোসল করার পূর্বেও সহবাস করা উচিত নয়। কেননা, এ নিষেধাজ্ঞা কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত। তাছাড়া অনেকেই বলেন, এরূপ করলে কুষ্ঠরোগ হয়।

ডাক্তারদের মতে, ঋতুকালে রক্ত নির্গত হবার জন্য জরায়ুর রগসমূহ ঢিলা হয়ে পড়ে। ফলে জরায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই এ সময় সহবাস করা বা অংগুলি প্রবেশ করানো অনুচিত। কারণ এর ফলে রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে পারে এবং জরায়ুতে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকার ফলে কঠিন রোগ ব্যাধি দেখা দিতে পারে, যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হতে পারে।

ডাক্তাররা আরো বলেছেন, মাসিকের রক্তস্রাবের সাথে এমনসব রোগজীবাণু থাকে যে, তখন সহবাস করলে পুরুষেরও সংঘাতিক রোগ ব্যাধি হতে পারে।

কুরআন মজীদ হায়েয অবস্থাকে 'হুয়া আযা' বলে আখ্যায়িত করেছে। এর একটি অর্থ নোংরা বা ময়লা আর অপর অর্থ কষ্ট বা রোগ। সুতরাং হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে তা স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান সকলেরই রোগ ও কষ্টের কারণ হতে পারে। আল্লাহর বাণী কতই না সত্য!

ঋতুকালের সহবাসে রাসূলুল্লাহর ভয় প্রদর্শন

এ কারণেই নবী করীম (সা) ঋতুকালে সহবাস করার ব্যাপারে সাংঘাতিক ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

من اتى حائضا فقد كفر بما انزل على محمد –

www.bjilibrary.com

"যে ব্যক্তি ঋতুবতীর সাথে সংগম করলো, সে মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ বিধানের উপর কুফরী করলো।"

হাদীসে 'কুফরী করলো' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, যে ব্যক্তি বৈধ মনে করে এ ধরনের কাজ করলো, সে কাফির হয়ে গেলো। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নবী করীম (সা) কঠোরভাবে ভয় প্রদর্শন কিংবা ধমক প্রদানের জন্য 'কুফরী করলো' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে, যা নিম্নে আলোকপাত করা গেলো ঃ

● ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানীফার মত হলো, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তওবা করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ-ছাড়া কোনো কাফফারা দিতে হবেনা।

● ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, এ ব্যাপারে ঐ হাদীসে বর্ণিত বিধানই উত্তম, যেটি মুকসিম (র)–এর সূত্রে আবদুল হামীদ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি এরূপ কর্ম করবে সে এক বা অর্ধ দীনার সদকা করবে।"

[ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে হাদীসটি গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন এবং ইমাম তাবারী এটি খুব পসন্দ করেছেন।]

কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, (যা তিনি বাগদাদে থাকা অবস্থায় বলেছেন,) সদকা না দিলে ঐ ব্যক্তির কোনো গুনাহ হবেনা।

● হাদীস বিশেষজ্ঞদের একটি দলের মত হলো, রক্ত প্রবাহের সময় সংগম করলে এক দীনার সদকা করবে এবং রক্ত প্রবাহে বিরতি ঘটার সময় করলে অর্ধ দীনার সদকা করবে।

● ইমাম আওযায়ী বলেছেন, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলে পাঁচ দীনার সদকা করতে হবে।

www.bjilibrary.com

এই সবগুলো হাদীস এবং মতামতের সূত্র ও বিস্তারিত আলোচনা আবু দাউদ এবং দারু কুতনী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

● তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "কেউ যদি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে লাল রক্ত প্রবাহের সময় সংগম করে, তবে সে এক দীনার সদকা দেবে। রক্তের রং হলুদ হলে অর্ধ দীনার সদকা করবে।"

প্রশ্ন হলো আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ -

"এবং তাদের কাছে গমন করোনা, যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়।"

এখানে "যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়" বলতে আল্লাহ তাআলা কি বুঝাতে চেয়েছেন?

কেউ কেউ মনে করেন, এর অর্থ পানি দিয়ে গোসল করা। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন গুপ্তাঙ্গ ধোয়া। অর্থাৎ মাসিক বন্ধ হবার পর কেবল গুপ্তাঙ্গ ধুইয়ে নিলেই সহবাস করতে পারবে। এর জন্য গোসল না করলেও চলবে।

যখন গোসল করলেও পাক হয় না

নুফাসা এবং ঋতুবতীর রক্ত বন্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত সে অযু করুক কিংবা গোসল করুক, তাতে সে পবিত্র হবেনা।

www.bjilibrary.com

১৪. প্রকৃতিগত পরিচ্ছন্নতা

* আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط – (بخارى ، مسلم ومسند احمد)

"প্রকৃতিগত পাঁচটি সুন্নত কাজ আছে ঃ (১) খতনা করা (২) ক্ষৌর কর্ম করা অর্থাৎ গুপ্ত স্থানের লোম পরিষ্কার করা (৩) মোচ বা গোঁফ ছাঁটা(৪) নখ কাটা এবং (৫) বগলের লোম পরিষ্কার করা।"
[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন; নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

عشر من الفطرة ، قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء – (مسلم)

"দশটি প্রকৃতিগত সুন্নত কাজ আছে। সেগুলো হলো (১) মোচ বা গোঁফ ছাঁটা, (২) দাঁড়ি বড় করা, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া,(৫) নখ কাটা, (৬) জোড়াসমূহ ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়ে ফেলা, (৮) গুপ্তাংগের লোম মুণ্ডন করা, (৯) মলমূত্র ত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন হওয়া।" [মুসলিম]

এখানে নয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটির বর্ণনাকারী মুসআব বলেন, দশমটির কথা আমি ভুলে গেছি। তবে খুব সম্ভবত সেটা হলো 'কুল্লি করা'।

ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান, যেখানে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি এই গুরুত্ব থেকেই বুঝা যায়, ইসলাম কতটা সৌন্দর্য প্রিয়। মূলত ইসলাম তার অনুসারীদের

www.bjilibrary.com

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতিশয় পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়। রাখতে চায় নির্মল অনাবিল। এ কারণেই হাদীসে উল্লেখিত কাজগুলোর প্রতি সে গুরুত্বারোপ করেছে।

হাদীস দু'টিতে যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ যদি সেগুলো সঠিকভাবে পালন করে, তবে সে হুবহু সেই প্রকৃতিরই অনুসরণ করলো, যার উপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ নিজে এগুলো পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি মানুষের জন্য এ কাজগুলো এ কারণেই পসন্দ করেন, যাতে করে তারা এগুলো করার মাধ্যমে উন্নত বৈশিষ্ট্য এবং উত্তম আকৃতির অধিকারী হতে পারে।

এখানে সৃষ্টিগত বা প্রকৃতিগত কাজ বলতে সেইসব কাজকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো সকল নবী করেছেন এবং যেগুলো পালন করার ক্ষেত্রে সকল শরীয়তে ঐক্য রয়েছে। এগুলো এমন কাজ, যেগুলো পালন করার ক্ষেত্রে সকল সুস্থ প্রকৃতির লোক একমত না হয়ে পারেনা। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে সৃষ্টিগত বা প্রকৃতিগত বলতে আল্লাহর দীনকে বুঝানো হয়েছে।

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোর আলোকে কেউ কেউ প্রকৃতিগত বা অভ্যাসগত কাজ পাঁচটি উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন দশটি। কিন্তু সাধারণভাবে আলিমগণ দুইটি হাদীসে বর্ণিত সবগুলো জিনিসকেই অভ্যাসগত সুন্নত গণ্য করেন। তাদের মতে এর সংখ্যা এগারটি। এগুলোর মধ্য থেকে আমরা এখানে কয়েকটির বিষয়ে আলোচনা করবো, যেগুলো মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে জরুরী।

গুপ্তাংগের লোম পরিষ্কার করা

এ প্রসঙ্গে হাদীসে 'ইসতেহ্‌দাদ' অর্থাৎ লোহা ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। লোহা ব্যবহার করা মানে ক্ষুর ইত্যাদির মাধ্যমে লোম কামিয়ে ফেলা। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে 'হাল্‌কুল আনাতি'। 'আনাত' নাভীর নীচের সেই অংশকে বলা হয়, যেখানে নারী পুরুষের গুপ্তাঙ্গের চারপাশে লোমাচ্ছন্ন থাকে।

www.bjilibrary.com

যাই হোক, হাদীসে 'ইসতেহ্‌দাদ' এবং 'হাল্‌কুল আনাতি' বলতে নারী পুরুষের গুপ্তাংগের চারদিকের লোম কামিয়ে ফেলা বুঝানো হয়েছে। বুঝানো হয়েছে ক্ষুর প্রভৃতি লোহার জিনিস দিয়ে কামিয়ে ফেলাকে। কিন্তু কেঁচি বা অন্য কিছু দিয়ে পরিচ্ছন্ন করাও জায়েয।

শাইখ ইবনে দাকীকুল ঈদ লিখেছেন, অনেক আলিমের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মহিলাদের জন্য ক্ষুর জাতীয় জিনিস দিয়ে লোম কামিয়ে ফেলা উত্তম। কেননা, টেনে উঠিয়ে ফেলার মাধ্যমে চামড়া ঢিলা হয়ে যায়।

ইমাম নববী এবং আরো কিছু আলিম বলেছেন, নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই গুপ্তাংগের লোম ক্ষুর (ব্লেড প্রভৃতি) দিয়ে কামিয়ে ফেলা সুন্নত। বুখারী এবং মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) সফর থেকে হঠাৎ করে রাত্রে এসে ঘরে প্রবেশ করতে এবং স্ত্রীর নিকট গমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, সফর থেকে ফেরার বিষয়ে যেনো পূর্বেই স্ত্রীকে সংবাদ দেয়া হয়, যাতে করে তারা চুল আঁচড়িয়ে এবং লোম পরিষ্কার করে নিয়ে সেজেগুজে থাকার সুযোগ পায়।

লোম কামানো চুল আঁচড়ানো অংগাদি পরিচ্ছন্ন রাখা অতি উত্তম কাজ। এর ফলে শরীরে ময়লা জমেনা। মাথায় উকুন থাকেনা। এর ফলে অনেক রোগ থেকে বাঁচা যায়। তাছাড়া গুপ্তাংগের লোম পরিষ্কার না করলে দুর্গন্ধও হয়ে থাকে।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বগল এবং গুপ্তাংগের লোম পরিষ্কার করার ব্যাপারে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এসব কাজ যেন চল্লিশ দিনের অধিক বিলম্বিত না হয়। [মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী এবং আবু দাউদ]।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, "নবী করীম (সা) আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।" ইমাম নববী লিখেছেন, এর অর্থ হলো, এসব কাজ যেন চল্লিশ দিনের অধিক বিলম্বিত করা না হয়। এর অর্থ এই নয় যে, চল্লিশ দিনই বিলম্ব করতে হবে, তার আগে ফেলা যাবেনা।

www.bjilibrary.com

মোট কথা, আলোচনার সারমর্ম হলো, কতদিন পর পর লোম পারিষ্কার করতে হবে তার কোনো সীমাবদ্ধ সময় নেই। বরঞ্চ হাদীসের দাবী হলো, লোম বড় হলেই কামিয়ে ফেলা সুন্নাত, তবে যেন চল্লিশ দিন অতিক্রম না করে। চল্লিশ দিন অতিক্রম করাটা অনুচিত। এ আদেশ নারী পুরুষ উভয়েরই জন্য।

মনে রাখা দরকার, একজন পুরুষের অপর পুরুষের সামনে গুপ্তাংগের লোম পরিষ্কার করা হারাম। একইভাবে একজন নারীর অপর নারীর সামনে এ কাজ করা বা অপর নারীর দ্বারা এ কাজ করানো হারাম। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞ মেয়েরা এরূপ করে থাকে। শরীয়ত শরীরের যেসব অংগ ঢেকে লুকিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো স্বামী স্ত্রী ছাড়া অপর কারো সম্মুখে উন্মুক্ত করা নাজায়েয। অর্থাৎ স্ত্রীর জন্য স্বামীর সামনে এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর সামনে স্বীয় সতর উন্মুক্ত করা বৈধ। অপর কারো সম্মুখে উন্মুক্ত করা নিষিদ্ধ।

মুয়াবিয়া বিন হায়দরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম(সা)–এর নিকট নিবেদন করলামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! শরীরের সতর (ঢেকে রাখার অংগ) সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ অংগ দেখা জায়েয আর কোন্ কোন্ অংগ দেখা নাজায়েয? জবাবে তিনি বলেন ঃ

احفظ عورتك الامن زوجتك اوما ملكت يمينك –

"নিজ দেহের সতরযোগ্য অংগগুলো সতর করে (ঢেকে) রাখো, স্বীয় স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অপর কারো সামনে সেগুলো উন্মুক্ত করোনা।"

মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি আরয করলাম ঃ 'পুরুষের সামনে পুরুষের এবং নারীর সামনে নারী সতর করাও কি জরুরী? তিনি বলেন ঃ

ان استطعت ان لايراها احد فلا يرينها –

"অপর কেউ তোমার সতর করার অংগসমূহ দেখবে না এমনটি করা যদি সম্ভব হয়, তবে অবশ্যি তা করো।"

www.bjilibrary.com

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি একা থাকি এবং আমার কাছে যদি কেউ বর্তমান না থাকে, সে অবস্থায় কি উন্মুক্ত করতে পারি? তিনি বললেন ঃ

فالله احق ان يستحيا منه –

"আল্লাহই সর্বাধিক অধিকারী যে, তাঁর সামনে লজ্জা অনুভব করবে।"
[মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ]

আল্লাহর সামনে সর্বাধিক লজ্জা অনুভব করার অর্থ হলো, একজন মুসলমানের উচিত, সাধ্যানুযায়ী সতরের অংগসমূহ ঢেকে গোপন করে রাখা।

আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المراة الى عورة المراة ولا يفضى الرجل الى الرجل فى الثوب الواحد ولا تفضى المراة الى المراة فى الثوب الواحد – (مسلم و احمد)

"কোন পুরুষ অপর পুরুষের গোপন অংগের প্রতি তাকাবেনা। কোনো নারী অপর নারীর গোপন অংগের প্রতি তাকাবেনা। কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের (লেপ, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি) নিচে শুইবেনা। কোনো নারী অপর নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে শুইবেনা।" [মুসলিম, আহমদ]

এক কাপড়ের নিচে না শোয়ার অর্থ হলো, খালি গায়ে একজনের সাথে আরেকজন ঘেঁসে না শোয়া।

ক্ষৌর কর্ম প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন হলো, মেয়েদের মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্থানের অতিরিক্ত লোম পরিষ্কার করা জায়েয কিনা?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, বকরা বিনতে উকবা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) কাছে এসে মেহেন্দী সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে তিনি বলেন ঃ "মেহেন্দীর গাছও পবিত্র এবং যে পানিতে তা মাড়ানো হয় তাও পবিত্র।" অতপর বকরা মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্থানের লোম পরিষ্কার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

www.bjilibrary.com

জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ "তোমার যদি স্বামী থাকে এবং যদি সম্ভব হয় তবে চোখের ঢিলা পরিবর্তন করে নেবে।"

সুতরাং মেয়েদের জন্য তাদের মুখমন্ডল কিংবা দেহের অতিরিক্ত লোম পরিষ্কার করাতে কোনো দোষ নেই। তবে মাথার চুলের সম্মান করা, যত্ন করা এবং সংরক্ষণ করা জরুরী। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহিলাদেরকে চুল আঁচড়াবার তাকীদ করতেন।

খতনা করা

উম্মে আতিয়া আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেন, মদীনায় এক মহিলা ছিলেন, যিনি মেয়েদের খতনা করতেন। নবী করীম (সা) তাকে বলেছিলেন ঃ

لاتنكهى فان ذالك احظى للمراة واحب الى البعل -

(سنن ابى داود)

"বেশী তলিয়ে কেটোনা। কারণ এতেই মেয়েদের জন্য রয়েছে কমনীয়তা এবং স্বামীদের জন্য আকর্ষণ"

খতনা প্রকৃতিগত সুন্নাতসমূহের অন্যতম। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে এ কথা উল্লেখ আছে। খতনা মানে–কর্তন করা বা নির্দিষ্ট অংগ কর্তন করা।

পুরুষদের খতনায় লিংগের সেই বর্ধিত চামড়াটি কেটে ফেলা হয় যা লিংগের মাথাকে ঢেকে রাখে। আলগা চামড়াটির গোড়া পর্যন্ত কাটা মুস্তাহাব। ইমামুল হারামাইন লিখেছেন, খতনায় ঐ চামড়াটিই কাটতে হয়, যা লিংগের মাথা ঢেকে রাখে।

হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাকী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) হাসান এবং হুসাইন উভয়ের খতনা করিয়েছেন, তাদের জন্মের সপ্তম দিনে।

www.bjilibrary.com

মেয়েদের খতনায় কাটতে হয় সেই জিনিসটির সামান্য অগ্রভাগ যা তাদের যোনিদ্বারের একটু উপরে থাকে, যেটি দেখতে অনেকটা মুরগীর মাথার কলকীর মতো দেখায়। এ ব্যাপারে জরুরী কথা হলো, কেবল ঐ জিনিসটির উপরিভাগের সামান্য চামড়াই কাটতে হবে, গোটা অংশটুকু গোড়া থেকে কেটে ফেলা যাবেনা। নবী করীম (সা) এ কথাই বলেছেন যে, তলিয়ে কেটোনা। অপর একটি হাদীসেও এরূপই বলা হয়েছে। হাদীসটির মর্ম হলো, উপরের দিকে উঠে থাকা জিনিসটির মাথা থেকে সামান্য একটু চামড়া কেটে ফেলো, ওটার গোড়া থেকে কেটোনা।

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম তাঁর 'তুহফাতুল ওদুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসের বক্তব্যের ধরন থেকে বুঝা যায়, সামান্য কাটার কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (সা)–এর বক্তব্য হলো, উপরের দিকে উঠা জিনিসটি রেখে দাও। ওটার মাথা থেকে হালকা একটু চামড়া কেটে ফেলো।

খতনা প্রসঙ্গে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম নববীর 'আল মজমু' গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী শাফেয়ীদের মত হলো, খতনা পুরুষ ও নারী উভয়েরই জন্য ওয়াজিব। এ ব্যাপারে তাদের মযহাবে নিজেদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

ইমাম ইবনে কুদামার 'আলমুগনী' গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী হাম্বলী মযহাবের মত হলো, খতনা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। নারীর জন্য ওয়াজিব নয়, উত্তম। অধিকাংশ আলিমের এটাই মত।

হানাফী এবং মালেকী মযহাবে খতনা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সুন্নাত এবং মুসলমানের নিদর্শন।

যেসব ফকীহ পুরুষদের খতনা করাকে সুন্নাত বলেছেন, তাদের দলীল হলো মুসনাদে আহমদ এবং বায়হাকীতে বর্ণিত এই হাদীসটি ঃ

الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى النساء –

"খতনা পুরুষদের জন্য সুন্নাত এবং মেয়েদের জন্য মর্যাদা ব্যঞ্জক।"

সুতরাং মেয়েদের খতনা করা ওয়াজিবও নয়, সুন্নাতও নয়। বরঞ্চ একটি সম্মানজনক এবং মুস্তাহাব কাজ। অর্থাৎ মেয়েদেরকে নির্দিষ্ট

www.bjilibrary.com

করে খতনা করার হুকুম দেয়া হয়নি। তাছাড়া বেশী কাটতে নিষেধ করা হয়েছে। হালকা সামান্য একটু কাটাকে উত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের খতনা করা না হলে গুনাহ হবেনা। শুধু এতটুকু কথা বলা যায় যে, একটি উত্তম কাজ করা হলোনা।

অনেকগুলো আরব দেশে বিশেষ করে সুদানে যে ফেরাউনী খতনা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তাতে উপরের দিকে উঠে থাকা জিনিসটি গোড়া থেকে কেটে দেয়া হয়। এটা অকাট্য হারাম এবং সুন্নাতের খেলাফ কাজ। এটা জাহেলী যুগের নিয়ম। এমনটি মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। তাছাড়া এমনটি দ্বারা নারী পুরুষ উভয়েই সেই জৈবিক স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালার একটি অনুগ্রহ। এতে মেয়েদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যও কমে যায়।

বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা

সকল ফকীহ এ বিষয়ে একমত যে, বগলের লোম উপড়ে ফেলা বা চেঁচে ফেলা সুন্নাত। এ বিধান নারী পুরুষ উভয়েরই জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

ইউনুস বিন আবদুল আ'লা বলেছেন, আমি একবার ইমাম শাফেয়ীর সাথে সাক্ষাত করতে যাই। গিয়ে দেখি নাপিত তাঁর বগলের লোম কামিয়ে পরিষ্কার করছে। আমাকে দেখে শাফেয়ী (র) বললেন ঃ আমি জানি, বগলের লোম উপড়ে ফেলাই সুন্নাত। কিন্তু সেই কষ্ট আমার সহ্য হয় না।

লোম পরিষ্কার করার কাজ প্রথমে ডান বগল থেকে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। এমনকি জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, অযু করাসহ সকল কাজ তিনি ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন। [মুসলিম]

তাই প্রত্যেক নারীর চাই সে বালিকা হোক কিংবা বয়স্কা, বিবাহিতা হোক কিংবা কুমারী তার উচিত প্রকৃতিগত সুন্নাতসমূহ

www.bjilibrary.com

পালন করা, বগলের লোম বড় হলেই সেগুলো পরিষ্কার করা, এবং এ ব্যাপারে চল্লিশ দিন যেন অতিক্রম না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

কারণ এসব সুন্নাত পালন করার ফলেইতো মুসলিম মহিলারা অমুসলিম নারীদের চেয়ে মর্যাদাবান হয়ে থাকে।

নখ কাটা

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) জুমার দিন নামাযে যাবার আগে স্বীয় মোচ এবং নখ কেটে নিতেন। [তাবরানী, বাযযার]

তাই নখ কাটা প্রকৃতিগত সুন্নাত পন্থাসমূহের অন্যতম। ফকীহরা এ ব্যাপারে সর্বসম্মত যে, নখ কাটা সুন্নাত। কিন্তু এর কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই। অবশ্য জুমআর দিন নর্খ কাটা মুস্তাহাব।

এ কথা আগেই জানানো হয়েছে যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল রাংগানো, চুল কালো করা এবং নখ সাজানো হারাম। স্বামী অনুমতি দেবার পরও এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়, বিশুদ্ধতম মত হলো স্বামী অনুমতি দিলেও এসব করা হারাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত অনুযায়ী আমল করাই মুসলিম মহিলাদের কর্তব্য। তাদের কর্তব্য পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানী করা সকল বিদআত থেকে আত্মরক্ষা করা। যেমন, নখ পালিশ করা এবং নখ লম্বা করা।

ইমাম নববী লিখেছেন, নখ কাটার ক্ষেত্রে প্রথমে হাতের এবং পরে পায়ের নখ কাটা সুন্নত। তাছাড়া ডান হাতের শাহাদাত আংগুল থেকে কাটতে আরম্ভ করা উচিত। অর্থাৎ প্রথমে শাহাদাতের আংগুল তার পর তার ডান দিকের তিনটি। অতপর বাম হাতের নখ কাটবে ডান হাতের যেভাবে কাটা হয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ ছোট আংগুলটি থেকে শুরু করে বুড়ো আংগুল পর্যন্ত। অতপর ডান পায়ের ডান পাশের ছোট আংগুলটি থেকে শুরু করে বাম পায়ের ছোট আংগুলটিতে গিয়ে শেষ করবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) কর্তিত নখ এবং চুল মাটিতে পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

১৫. নগ্নতা ও পোষাক

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ – (الاعراف : ٣١)

"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময় নিজেদের যীনত (সৌন্দর্য) গ্রহণ করো।" [আল আ'রাফ ঃ ৩১]

যদিও সেই সব আরব মুশরিকদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াই আয়াতটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য, যারা নগ্ন হয়ে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতো। কিন্তু আয়াতটিতে সাধারণভাবে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ব মানবতাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, বিশেষভাবে ইবাদতের সময় তোমরা নিজেদের সৌন্দর্য ও পোশাক দ্বারা ভূষিত হও।

সহীহ মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, জাহেলী যুগে আরবের নারীরা উলংগ হয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফ করতো। এরি পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করে বলে দেন ঃ "তোমরা প্রত্যেক ইবাদতের সময় নিজেদের সৌন্দর্য (পোষাক) গ্রহণ করো।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনায় যেসব নারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একজনের নাম দাবা'আহ বিনতে আমির। এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম (সা) নির্দেশ প্রদান করেন, এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক আল্লাহর ঘরে হজ্জ করতে পারবেনা। নগ্ন অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করতে পারবেনা।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, নামাযের সময় শরীরের সতরযোগ্য অংগগুলো ঢেকে রাখা জরুরী। সুতরাং সামর্থ থাকা অবস্থায় সতরযোগ্য অংগসমূহ ঢাকা ব্যতিরেকে নামায হবেনা।

যেসব অংগ ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে, সেগুলো কারো সম্মুখে উন্মুক্ত করা চরম নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা। সতর মানে ঢেকে রাখা বা

www.bjilibrary.com

লুকিয়ে রাখা। সুতরাং সতর করতে হয় বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রেখে এবং দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখে।

তাই খেয়াল রাখতে হবে, পরিধেয় বস্ত্র যেন খুবই হালকা পাতলা না হয়, কিংবা যেন খুব আঁটসাঁট না হয়। অংগসমূহ যেনো বুঝা না যায়।

বিশেষ অংগসমূহ ঢেকে রাখা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এগুলো অপরের সামনে উন্মুক্ত করা ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয। অপরের সতরযোগ্য অংগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও জায়েয নয়। এ বিষয়ে আমরা পবিত্রতা অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি।

মুসলিম শরীফে হযরত সহল বিন সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)–এর পেছনে নামায পড়ার সময় দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাপড়ের সংকীর্ণতার কারণে শিশুদের মতো তহবন্দ গলায় বেঁধে নিতেন আর কেউ কেউ বলতেন, হে মহিলাগণ! পুরুষরা সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগে তোমরা মাথা উঠাবেনা।

ইমাম নববী লিখেছেন, হযরত সহল ইবনে সা'আদের বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, সেই সময় কাপড়ের এতোই স্বল্পতা ছিলো যে, পরনের বস্ত্র ছোট হবার কারণে সাহাবীগণ তা গলার সাথে ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে করে শরীরের কোনো সতরযোগ্য অংগ উন্মুক্ত না থাকে। এ থেকেই বুঝা যায়, তারা সতরযোগ্য অংগগুলো ঢেকে রাখার ব্যাপারে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বস্ত্র ছোট থাকার কারণে রুকু–সিজদায় যাবার সময় কোন সতরযোগ্য অংগ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে কিনা এই ভয়ে তারা মহিলাদেরকে সতর্ক করতেন। তারা তো পুরুষদের পেছনের সফে নামাযে দাঁড়াতেন। তাই তাদেরকে পুরুষরা সোজা হয়ে উঠার পর রুকু সিজদা থেকে মাথা উঠাতে বলতেন।

মহিলারা নামাযে শরীরের কোন্ কোন্ অংশ ঢেকে রাখবে?

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا – (النور : ٣١)

www.bjilibrary.com

"এবং তারা যেন নিজেদের যীনত বা সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে (সেটার কথা ভিন্ন) যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

এ আয়াতে মহিলাদেরকে দেহাংগের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সম্মুখে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(১) রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا يقبل الله صلوة حائض الابخمار –

"ওড়না পরা ছাড়া আল্লাহ কোনো বালিগা নারীর নামায কবুল করেননা।"

নাসায়ী ছাড়া সিহাহ সিত্তার বাকী পাঁচটি গ্রন্থেই হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে। ইবনে খুযাইমাহ এবং হাকেম এটিকে 'সহীহ হাদীস' বলেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি 'হাসান'।

(২) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (সা)–কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! মহিলারা কি অন্তর্বাস ছাড়া শুধু জামা এবং ওড়না পরে নামায পড়তে পারে? তিনি বললেন ঃ

اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قد ميها –

"হ্যাঁ পারে। তবে শর্ত হলো, জামা এতোটা লম্বা হতে হবে, যাতে করে পায়ের পাতাও ঢেকে থাকে।" এ হাদীসটি আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

لابد للمراة من ثلاثة اثواب تصلى فيها : درع وجلباب وخمار

"নামাযের সময় মহিলারা তিনটি কাপড় পরবে সেগুলো হলো (১) লম্বা জামা (২) বড় চাদর যা গোটা শরীর ঢেকে রাখবে (৩) ওড়না।"

ইবনে সা'আদ সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা) নামায পড়ার সময় নিজের তহবন্দ খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে চাদরের মতো শরীর ঢেকে নিতেন।

www.bjilibrary.com

(৪) প্রায় একই রকম কথা বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)। তাঁর বক্তব্য হলো ঃ

اذا صلت المراة فلتصل فى ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة -

"মেয়েরা নামায পড়ার সময় পূর্ণ পোশাক পরিধান করবে। অর্থাৎ জামা, ওড়না এবং সেলোয়ার বা তহবন্দ পরবে।"

এটি ইবনে আবী শাইবা তাঁর 'আল মুসান্নিফ' গ্রন্থে সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

(৫) অপর একটি বর্ণনা এ রকম। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ "মহিলাদের কয়টি কাপড় পরে নামায পড়া উচিত?" জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "যাও আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তারপর এসে আমাকে জানাবে। প্রশ্নকর্তা হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন ঃ ওড়না পরবে এবং লম্বা চওড়া জামা পরবে যা গোটা শরীর ঢেকে রাখবে।" প্রশ্নকর্তা হযরত আয়েশার (রা) নিকট ফিরে এসে হযরত আলীর (রা) বক্তব্য তাঁকে অবহিত করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি সঠিক বলেছেন।

সবগুলো বর্ণনা থেকে যা প্রমাণ হয়, তাহলো নামায পড়ার সময় মেয়েরা ওড়না পরবে এবং লম্বা চওড়া কামীস পরবে। ওড়না এমন হতে হবে যা পুরো মাথা ঢেকে রাখবে। অবশ্য মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা জরুরী নয়।

ওড়না ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ - (النور : ٣١)

"এবং তারা যেন নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে।" [সূরা আন নূর ঃ ৩১]

আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট হলো, সেকালে মেয়েরা শাড়ীর আঁচল দিয়ে মাথা ঢাকলেও তাদের বুক এবং গলা থাকতো খালি। আঁচলের

www.bjilibrary.com

মাথা পিঠের দিকে ফেলে রাখতো। তাই আল্লাহ তাআলা আয়াতটি নাযিল করে তাদের নির্দেশ দিলেন, "ওড়না বা শাড়ীর আঁচল মাথার উপর থেকে নিচের দিকে বুকের উপর ছেড়ে রাখো এবং পুরো বুক ঢেকে রাখো।"

যেহেতু জামা এবং চাদর পরার পরও গ্রীবা ফাঁকা থাকে সে কারণে, ওড়না দিয়ে গ্রীবা ঢেকে রাখবার হুকুম দেয়া হয়েছে। এটা সতরের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বুক, ঘাড়, গ্রীবা ইত্যাদিও সেইসব অংগের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর সতর করা অপরিহার্য।" এ কথাগুলো বলেছেন ইমাম ইবনে হাযম (র) তাঁর 'আল মুহাল্লা' গ্রন্থে।

মহিলারা নামায পড়বার সময় কতটুকু সতর করবে? কতটুকু অংগ ঢেকে রাখবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মতপার্থক্য আছে। নিম্নে তাঁদের মতামত উল্লেখ করা হলো ঃ

● হাম্বলীদের মতে, নামাযে মহিলাদের পুরো শরীর ঢেকে রাখা জরুরী। এমনকি কানের নীচের বেরিয়ে থাকা চুলগুলোও ঢেকে রাখতে হবে। তাঁদের মতে, মুখমণ্ডল ছাড়া এ হুকুমের বাইরে আর কোনো অংগ নেই।

সুতরাং হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী, শরীরের কোনো সামান্য অংশও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং তা যতোক্ষণই উন্মুক্ত থাকুক না কেন, তাতে নামায নষ্ট হবেনা। কিন্তু উন্মুক্ত হয়ে থাকা অংশ যদি বেশী পরিমাণের হয়, যেমন চাদর খুলে যাওয়া এবং পুরোপুরি পড়ে যাওয়া, তবে যদি আমলে কাছীর[১] না করে সাথে সাথে শরীর ঢেকে নেয়া যায়, তাহলে নামায নষ্ট হবেনা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ শরীর উন্মুক্ত থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অল্প এবং বেশী সময় নির্ণয় হবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী। অর্থাৎ সাধারণত যেটাকে বেশী সময় মনে করা হয়, সেটাই বেশী সময়। কোনো মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ শরীরের অংশ যদি নামাযের সময় উন্মুক্ত রাখে তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে।

---

১. আমলে কাছীর ফিকহী পরিভাষায় এমন ক্রিয়াকর্মকে বলে যা করতে দেখে কর্তার ব্যাপারে এই ধারণা হয় যে, লোকটি নামায পড়ছে না। -অনুবাদক

www.bjilibrary.com

• হানাফীদের মতে, নামাযে স্বাধীন মহিলাদের পূর্ণ শরীর ঢাকা থাকতে হবে। এমনকি কানের নীচের ঝুলে থাকা চুলও উন্মুক্ত থাকতে পারবেনা। কারণ নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "আল-মারআতু আওরাতুন—নারী পুরোপুরিই ঢেকে রাখার বস্তু'। তবে হানাফীরা হাতের তালুকে এই নির্দেশের বাইরে মনে করেন। কিন্তু হাতের উপরের অংশ ঢাকা থাকতে হবে।

• শাফেয়ীদের মতেও নামাযে মহিলাদের গোটা দেহ ঢাকা থাকতে হবে। তবে, মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু খোলা থাকতে পারে। হাতের তালু এবং তালুর উপরের অংশও খোলা থাকতে পারে। কিন্তু এছাড়া পুরো শরীর ঢাকা থাকতে হবে। এমনকি কানের নীচে ঝুলে থাকা চুল এবং পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।

দেহের সতরযোগ্য কোনো অংশ যদি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও খোলা থাকে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য বাতাসে উড়িয়ে কাপড় ফেলে দিলে আমলে কাছীর ব্যতিরেকেই যদি সাথে সাথে ঢেকে নেয়া হয়, তবে নামায হবে। কিন্তু বাতাস ছাড়া অন্য কারণে যদি কাপড় পড়ে যায়, যেমন কোন পশুর কারণে বা কোন অজ্ঞাত কারণে, তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

• মালেকী মযহাবে নারীদেহের সতরযোগ্য অংগসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, 'আওরতে মুগাল্লাযা' এবং দুই, 'আওরাতে মুখাফফাফা'।

মুগাল্লাযা হলো নারী দেহের সেইসব অংশ যেগুলো স্বামী ছাড়া আর কারো সম্মুখে উন্মুক্ত করা নিষিদ্ধ। এমনকি মাহরাম (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম) আত্মীয়দের সম্মুখেও ঢেকে রাখা জরুরী। আর মুখাফফাফা হলো সেইসব অংগ যেগুলো মাহরামদের সামনে উন্মুক্ত রাখা বৈধ বটে, তবে অমাহরামদের সামনে উন্মুক্ত রাখা নিষেধ।

তাঁদের মতে, স্বাধীন মহিলাদের হাতের তালু, পা, বুক এবং বুকের বিপরীত দিকের পিঠ ছাড়া বাকী গোটা দেহ 'আওরতে মুগাল্লাযা'। আর বক্ষ, বক্ষের বিপরীত দিকের পিঠের অংশ, দুই বাহু, ঘাড়, মাথা এবং হাঁটু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত অংগসমূহ হলো 'আওরতে মুখাফফাফা'।

www.bjilibrary.com

মালেকীদের মতে মুখমণ্ডল এবং পুরো দুই হাত আওরত (ঢেকে রাখা অপরিহার্য এমন অংগ) নয়। অর্থাৎ নামায পড়ার সময় এগুলো ঢেকে রাখা জরুরী নয়। শরীরের যেসব অংগ আওরতে মুগাল্লাযা সেগুলো পূর্ণ বা আংশিক তা যতো কমই হোকনা কেন? ঢেকে রাখার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি খোলা রেখে কোনো মহিলা নামায পড়ে, তবে তার নামায হবেনা। সামর্থ বলতে বুঝায় ক্রয় করার সামর্থ, কারো নিকট থেকে চেয়ে পাওয়ার সামর্থ এবং ধারকর্জ পাওয়ার সামর্থ। কোনো মহিলা যদি আওরতে মুগাল্লাযাসমূহ পুরো ঢেকেই নামায আরম্ভ করে। কিন্তু হঠাৎ নামাযের মধ্যে কোনো অংগ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, তবে মালেকীদের প্রসিদ্ধ মত হলো, এমতাবস্থায় নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং ঐ মহিলাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

অবশ্য আওরতে মুখাফফাফা অংগসমূহ পূর্ণ বা আংশিক খোলা থাকলে নামায নষ্ট হয়না, যদিও নামাযে এসব অংগ খোলা রাখা হারাম কিংবা মাকরূহ এবং সেগুলোর প্রতি তাকানোও হারাম। কিন্তু কোনো মহিলা যদি আওরতে মুখাফফাফার অংগসমূহ খোলা রেখে নামায পড়ে তবে সাথে সাথে পুনরায় নামায পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর তা পড়তে হবে পূর্ণ আচ্ছাদনের সাথে।

এ যাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, তার সার কথা হলো, নামায পড়বার সময় মহিলাদেরকে পুরো শরীরই ঢেকে নেয়া উচিত। এমনকি পায়ের পাতাও ঢেকে নেয়া উচিত। এমন পাতলা কাপড় পরবেনা যা দিয়ে শরীর দেখা যায়। এমন আঁটসাঁট পোশাকও পরবেনা যাতে সতরযোগ্য অঙ্গসমূহ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

www.bjilibrary.com

১৬. মাহরাম কারা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَآئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ - (النور : ٣١)

"তারা যেন নিজেদের যীনত বা সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে এই লোকদের ব্যতীত ঃ তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজ ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, স্বীয় মেলামেশার মহিলা, স্বীয় দাসদাসী, নিজ অধীনস্থ পুরুষ যারা বিনীত নির্লিপ্ত এবং এমন শিশু মহিলাদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে যাদের এখনো বোধোদয় হয়নি। [সূরা আন নূর ঃ ৩১]

এই আয়াতে সেইসব লোকদের কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে, যাদের সামনে মহিলারা নিজেদের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। তবে এই প্রকাশ প্রকাশের উদ্দেশ্যে হবেনা, হবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে।

একজন মহিলার মূল মাহরাম হলো, তার স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, বোনপো। কিন্তু আয়াতে এই মূল মাহরামদের সাথে আরো কিছু লোককে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ নিজ মেলামেশার মুসলিম মহিলা, দাস-দাসী, এমন অধীনস্থ পুরুষ যে যৌনবাসনাহীন এবং মহিলাদের গোপন বিষয় সম্পর্কে বোধোদয় হয়নি এমন শিশু।

www.bjilibrary.com

প্রথমেই স্বামীর কথা বলা হয়েছে। মূলত স্বামীর অধিকার কেবল এতোটুকুই নয়, বরং আরো অনেক কিছু। স্ত্রীর গোটা দেহ দেখা এবং উপভোগ করা তার জন্য হালাল। এ কারণেই সবার আগে স্বামীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সকল দিক থেকে স্ত্রীকে দেখার সর্বাধিক অধিকার রয়েছে তার। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ (المومنين : ٥-٦)

"(সফল হয়েছে সেই সব মুমিন) যারা নিজেদের লজ্জা স্থানের হিফাযত করে। তবে স্বীয় স্ত্রী এবং দাসীদের বিষয়ে আলাদা কথা।"

[সূরা আল মুমিনূন ঃ ৫-৬]

স্বামী স্ত্রীর গুপ্তাংগ দেখতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি মত পাওয়া যায়। একটি মতে স্বামীর জন্য স্ত্রীর গুপ্তাংগ দেখা জায়েয। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর থেকে সকল স্বাদ আস্বাদন করার অনুমতি রয়েছে এবং দেখা তো এর মধ্যে একটি ন্যূনতম বিষয়।

ইবনে খুওয়াইয মিনদাদ লিখেছেন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর গোটা দেহ এবং গুপ্তাংগের বহিরাংশ দেখা জায়েয। তবে ভেতরের দিকে দেখা নিষেধ। একইভাবে স্ত্রীর জন্যও স্বামীর গুপ্তাংগ দেখা জায়েয।

দ্বিতীয় মতটি হলো, গুপ্তাংগ দেখা জায়েয নয়। কারণ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম এবং তাঁর মধ্যকার (স্বামী স্ত্রীর) দৈহিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "আমি কখনো তাঁর বিশেষ অংগ এবং তিনি কখনো আমার বিশেষ অংগ দেখেননি।"

[মুসনাদে আহমদ]

কুরআন মজীদের প্রথমোক্ত আয়াতটিতে স্বামীর কথা উল্লেখ করার পর অন্যান্য মাহরামদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এ আয়াত থেকে বুঝা যায় মহিলাদের যীনত বা সাজ সৌন্দর্য দেখার ক্ষেত্রে স্বামী ও অন্যান্য মাহরামদের অবস্থা সমান। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার তা নয়। এ হুকুম মূলগতভাবে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

www.bjilibrary.com

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন মহিলার জন্য তার বাবা ও ভাইর তুলনায় সতীনের ছেলের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

সুতরাং কুরআনে উল্লেখিত মাহরামদের সামনে যীনত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে।

স্বামীর পিতা

সূরা নূরের যে আয়াতটি আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছি, তাতে মাহরামদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার ক্ষেত্রে 'আবায়িহিন্না' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'আবা' বলতে বাপ, দাদা, নানা এসবই বুঝা যায়। সুতরাং পিতা বলতে নিজ দাদা, পরদাদা এবং নানা, পরনানাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের সামনেও স্বামী এবং পিতার মতোই হিজাব ছাড়া আসা যাবে।

স্বামীর পিতা স্বামীর পিতাগণ বলতে এখানে স্বামীর পিতা, দাদা, পরদাদা, নানা ও পরনানাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্বামীর পুত্র

স্বামীর পুত্র বলতে স্বামীর অন্যান্য স্ত্রীর অর্থাৎ সতীনের পুত্র বুঝানো হয়েছে। এরূপ পুত্রের ঘরের নাতিও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভাই

ভাই বলতে বুঝায় নিজ মায়ের পেটের ভাই। সৎ মায়ের পেটের ভাই। এখানে তিন ধরনের ভাই অন্তর্ভুক্ত। এক, বাপ ও মায়ের দিক থেকে আপন ভাই। দুই, মায়ের দিক থেকে সৎ ভাই, তিন বাপের দিক থেকে সৎ ভাই।

ভাইপো ও বোনপো

এর অর্থ বোন এবং ভাইদের সব ধরনের পুত্র। সহোদর ভাই এবং শুধুমাত্র পিতা কিংবা শুধুমাত্র মায়ের দিকের ভাইয়ের পুত্ররাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এদের পুত্র এবং নাতি পরনাতিরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

www.bjilibrary.com

উপরে যেসব মাহরামের কথা উল্লেখ হলো, এরা হলো এমন মাহরাম যাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য বিয়ে হারাম। অর্থাৎ এরা জন্মগত মাহরাম।

চাচা—মামা

চাচা, মামাও মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নবী করীম (সা) বলেছেন, "কারো চাচা (এবং মামা) তার বাপেরই সমতুল্য।" চাচা এবং মামার জন্য ভাতিজী এবং ভাগিনীর শরীরের বৈধ অংগসমূহের প্রতি তাকানো জায়েয(অর্থাৎ মুখমণ্ডল, হাত এবং পায়ের তালু)। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবুল ক'ইসের (রা) ভাই আমার দুধ চাচা আফলাহ (রা) আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চান। এটা পর্দার বিধান নাযিল হবার পরবর্তী ঘটনা। আমি তাকে অনুমতি দিলামনা। অতপর নবী করীম (সা) ঘরে এলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম যে, আফলাহ আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেইনি। একথা শুনে তিনি আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাঁকে অনুমতি দেই। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও হাদীসটি তাদের গ্রন্থাবলীতে সংকলন করেছেন।

আবু দাউদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আফলাহ (রা) আমার ঘরে এলে আমি তাঁর থেকে পর্দা করি। তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে পর্দা করছো? অথচ আমি তোমার চাচা! আমি বললাম। দুধতো আপনার ভাইয়ের স্ত্রী পান করিয়েছে। অতপর নবী করীম (সা) ঘরে তশরীফ আনলে আমি তাঁর কাছে ঘটনাটা বলি। শুনে তিনি বললেন ঃ বাস্তবিকই সে তোমার চাচা। সে তোমার নিকটে আসতে পারে অর্থাৎ চাচার সাথে গায়রে মাহরামদের মতো পর্দা করার দরকার নাই।

চাচা এবং মামাও এমন আত্মীয় যাদের সাথে চিরতরে বিয়ে হারাম।

তাবেয়ীগণের মধ্যে ইমাম হাসান বসরীর এটাই মত। আবু বকর জাসসাস লিখিত আহকামুল কুরআন থেকেও এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কের কারণে যারা মাহরাম দুধ পানের দিক থেকেও তারা মাহরাম। রক্ত সম্পর্কের মাহরামদের ক্ষেত্রে যে বিধান প্রযোজ্য। দুধ পানের দিক থেকে যারা আত্মীয় তাদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

নিজ মেলামেশার মহিলা

নিজ মেলামেশার মহিলা বলতে পর্দানশীন মুসলিম মহিলা বুঝানো হয়েছে। এরা হলো দীনী বোন। এদের সামনেও রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে মানা নেই। অমুসলিম কাফির ও মুশরিক নারীদের সামনে রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করা নিষেধ। কারণ তারা নিজ পুরুষদের কাছে মুসলিম মহিলাদের রূপ সৌন্দর্যের কথা চর্চা করতে পারে।

ইবনে জুরাইজ, উবাদা ইবনে নসী এবং হিশামুল কারী খৃষ্টান মহিলা কর্তৃক মুসলিম মহিলাকে চুমু দেয়াও পসন্দ করতেননা। উবাদা ইবনে নসী বলেছেন, উমার (রা) আবু উবাইদা ইবনে জাররাহকে (রা) লিখেছিলেন ঃ

"আমি জানতে পেরেছি, কাফির মহিলারা মুসলিম মহিলাদের সাথে একই গোসলখানায় যায়। এ কাজ বন্ধ করে দাও। কারণ কাফির নারী কর্তৃক মুসলিম মহিলার সতর দেখার অনুমতি নাই।"

চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে আবু উবাইদা (রা) ঘোষণা করে দেন ঃ

"যেসব মহিলা চেহারা প্রদর্শনের জন্য গোসল খানায় (মূল শব্দ 'হাম্মাম' এ শব্দ দিয়ে এখানে মহিলাদের গণগোসলখানা বুঝানো হয়েছে) যায়, সেদিন আল্লাহ তাআলা এদের চেহারাকে কালো করে দেবেন, যেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল কিছু চেহারা হবে মলিন।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কোনো মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয় যে, ইহুদী খৃষ্টান মেয়েরা তাদেরকে দেখবে। নিজ মেলামেশার মহিলা বলতে মুসলিম মহিলা বুঝানো হয়েছে।

মুজাহিদ বলেছেন, মুসলিম মহিলারা মুশরিক নারীদের সামনে ওড়না খুলবেনা। কারণ নিজ মেলামেশার মহিলা বলতে মুশরিক নারী বুঝায়না।

www.bjilibrary.com

অবশ্য বিষয়টি প্রসঙ্গে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ

• হাম্বলীদের মতে, এ ব্যাপারে মুসলিম এবং কাফির মহিলাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত অংশ ছাড়া শরীরের বাকী অংশ কাফির নারীদের সামনে উন্মুক্ত করা হারাম নয়।

• অন্যসব ফকীহদের মত হাম্বলী ফকীহদের মতের চাইতে ভিন্নতর। তাদের মতে, কোনো কাফির নারী যদি কোনো মুসলিম নারীর দাসী হয়, তবে সে দাসী নিজ কর্ত্রীকে দেখতে পারে। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো কাফির নারীকে মুসলিম নারী রূপসৌন্দর্য দেখানো জায়েয নয়। কারণ, কাফির নারীরা 'নিজ মেলামেশার' নারী নয়।

এখানে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। উস্তাদ মুহাম্মদ ফাহমী আবদুল ওয়াহ্‌হাব তাঁর 'ওরাসাতুল কিতাব' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

মিশরে ইংরেজদের সম্রাজ্যবাদী শাসনামলে যখন তাদের প্রশাসক ছিলো লর্ড ক্রুমার, তখন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন শাইখ শরবীনী (র)। এ সময় মুসলমানরা ঈমানী জযবা নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল। সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌছল। লর্ড মনে করলেন, কোনো প্রকারে শাইখকে হাত করতে পারলে মুসলমানদের বশে আনা যাবে। তিনি সাক্ষাত করতে চাইলেন শাইখের সাথে। শাইখ সময় দিলেন। লর্ড তার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে যান, যাতে করে পারিবারিকভাবেও সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। শাইখের সাথে আলোচনায় লর্ড তার মনোবাঞ্ছা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে তার স্ত্রীকে শাইখের স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করানোর অনুরোধ করেন। শাইখ অস্বীকার করে জবাব দেন ঃ "আমি দুঃখিত, আমাদের মুসলিম মহিলাদের জন্য অমুসলিম নারীদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা ঠিক তেমনি হারাম, যেমনটি হারাম গায়রে মাহরামদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা।"

দাস দাসী

এ প্রসঙ্গে আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে ঃ

أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

www.bjilibrary.com

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন দাস এবং দাসী দু'টোই। তাছাড়া তারা মুসলিমও হতে পারে এবং আহলে কিতাবও হতে পারে।

আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন কেবলমাত্র দাসী। তাদের মতে এখানে দাস বুঝানো হয়নি।

প্রথম মত পোষণ করেন একদল আলিম। বাহ্যত হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মে সালামার (রা) মতও তাদের মতেরই অনুরূপ মনে হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ "দাস তার মহিলা মনিবের চুল দেখলে কোন দোষ নেই।"

আশহাব (র) বলেছেন, ইমাম মালিককে (রা) বলা হয়েছিল "মহিলারা কি ওড়না ছাড়া নপুংস পুরুষদের সামনে আসতে পারে?" তিনি জবাব দেন ঃ আসতে পারে নপুংস পুরুষটি যদি তার বা অন্য কারো দাস হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো স্বাধীন পুরুষ হলে তার সামনে আসতে পারেনা।

এই আলিমরা তাদের যুক্তির স্বপক্ষে এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন। আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) ফাতিমার (রা) কাছে একটি দাস নিয়ে এলেন, যেটি তিনি তাকে দান করেন। তখন ফাতিমার পরনে যে কাপড়টি ছিলো, সেটি এতোই ছোট ছিলো যে, মাথা ঢাকতে গেলে পা উদোম হয়ে পড়তো আর পা ঢাকতে গেলে মাথা থাকতো খোলা। তিনি সেটিকে একবার মাথার দিকে টানছিলেন আবার পায়ের দিকে। তার এ অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

انه ليس عليك باس ، انما هو ابوك وغلامك –

"না, এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই, কারণ সে তো (বয়সের দিক থেকে) তোমার বাপের সমতুল্য এবং তোমার গোলাম।"

দ্বিতীয় মতটি হলো আরেক দল আলিমের। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র) বলেছেন, তোমরা 'আও মা মালাকাতের' অর্থ করতে গিয়ে প্রতারিত হয়োনা। এর অর্থ গোলাম নয়, শুধুমাত্র দাসী।

ইমাম শা'বী মনে করেন, দাস কর্তৃক তার মহিলা মনিবের চুল দেখা মাকরূহ। মুজাহিদ এবং আতাও এ মতই পোষণ করতেন।

www.bjilibrary.com

তাছাড়া ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اذا كان لا حدى كن مكاتب وكان له مايودى فلتحتجب منه

"কোনো মহিলার যদি এমন কোনো গোলাম থাকে, যার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে (অর্থাৎ এরূপ চুক্তি হয়েছে যে, এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করলে তুমি স্বাধীন হয়ে যাবে) তার যদি আদায় করার মতো পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে সেই মহিলা যেন তার সাথে পর্দা করে।"

[মুসনাদে আহমদ ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ ২৮৯ পৃঃ]

দু'টি মতই আমরা সবিস্তারে আলোচনা করলাম। দু'টি মতের মধ্যে বাহ্যিক যে বিরোধ দেখা যায় তাতো কেবল এতোটুকুই যে, প্রথম মত অনুযায়ী গোলাম তার মনিব মহিলার কেবল চুল দেখতে পারে আর দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা পর্দা করাকেই জরুরী মনে করেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিতীয় মতের প্রতি। কেননা, যে কারণে মহিলাদেরকে গায়রে মাহরামদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, গোলামদের ক্ষেত্রেও সে কারণ বিদ্যমান।

বিনীত নির্লিপ্ত অধীনস্থ পুরুষ

এ প্রসংগে কুরআনের ভাষা হলো ঃ

اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

"গাইরা উলিল ইরবাহ' (غَيْرِ اُولِى الاِرْبَةِ) মানে হলো, এমন লোক, যাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যারা নিজের কাজের চিন্তায় মগ্ন থাকে। মহিলাদের প্রতি আকর্ষণবোধ করেনা। নির্লিপ্ত থাকে। যেমন, এমন সেবক বা অধীনস্থ চাকর, যে কখনো মনিবের সমকক্ষতা চিন্তাই করতে পারেনা এবং সেই সাথে নির্বোধ এবং নির্লিপ্তও বটে। এ প্রসঙ্গে মতের বিভিন্নতা আছে।

www.bjilibrary.com

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হলো, এতোটা নির্বোধ পুরুষ, যার কোনো প্রকার কামাসক্তিই নাই।

(২) মুজাহিদ (রা) বলেছেন, এর অর্থ হলো আহমক পুরুষ।

(৩) আরেকটি মতে, এর অর্থ হলো পুরুষত্বহীন ব্যক্তি।

(৪) অপর একটি মতানুযায়ী এর মানে হলো খাসী হওয়া পুরুষ।

(৫) অন্য একটি মতানুযায়ী এর অর্থ নারীভাবাপন্ন পুরুষ।

(৬) আরেকটি মতানুযায়ী একেবারে বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং এমন শিশু যার বুঝ জ্ঞান হয়নি।

(৭) অপর একটি মতানুযায়ী এর অর্থ এমন পুরুষ যে কোনো উঁচু পরিবারে থাকে, তারা তাকে খোরপোষ প্রদান করে আর সে জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকে এতোটা নির্বোধ যে, নারীর কথা চিন্তাই করেনা এবং তার কোনো যৌন বাসনাও নাই।

এই সবগুলো মতই প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক। এই মতগুলোতে যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা মূলত এমন ব্যক্তির মধ্যে একত্রেই সমাবেশ ঘটে থাকে, যে নির্বোধ, বুঝ জ্ঞান রাখে না এবং এতোটা কাপুরুষ যে, মেয়েদের ব্যাপারে আকর্ষণই বোধ করেনা।

আয়াতাংশের বক্তব্যের ধরন এবং তার সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মতামত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দু'টি বিষয় মীমাংসিত। এক, তারা এমন লোক, প্রকৃতিগতভাবেই যারা নারীর প্রয়োজন ও আকর্ষণ অনুভব করেনা। দুই, তাদের নিয়োগ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অন্যথায় তাদেরকে সামনে আসা যাওয়া করা থেকে নিষেধ করা জরুরী।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারীভাবাপন্ন ব্যক্তি নবী করীমের (সা) পরিবারে আসা যাওয়া করতো। সবাই তাকে 'গায়রা উলিল ইরবা' (নারীর প্রতি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত এবং প্রয়োজনহীন) মনে করতো। একবার নবী করীম (সা) এসে দেখেন সে এক মহিলার প্রশংসা করে বলছে ঃ মহিলাটি যখন সামনে আসে তখন তার পিঠে চারটি কুঞ্চন পড়ে। যখন পিছের দিকে যায় তখন পড়ে আটটি কুঞ্চন।

www.bjilibrary.com

আসলে এ কথা দ্বারা লোকটি ঐ মহিলার স্বামীর সাথে যৌন আচরণ সংক্রান্ত অবস্থারই চিত্র তুলে ধরছিল। তার এসব কথার প্রেক্ষিতে নবী করীম তাঁর পরিজনদের বলে দিলেন ঃ

الا ارى هذا يعلم ماهنا هنا ؟ لايدخلن عليكم هذا –

"আমার মনে হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যা কিছু হয়ে থাকে সে সব কিছুরই খবর এ রাখে। আর কখনো যেন সে তোমাদের কাছে না আসে।"

এর পর থেকে সবাই তার থেকে পর্দা করতে আরম্ভ করে। পরে নবী করীম (সা) তাকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং হেমায় পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মৃত্যু পর্যন্ত সে সেখানেই থাকে। আবু বকরের (রা) খিলাফত আমলে সে তাঁর নিকট মদীনা প্রত্যাবর্তনের আবেদন করে। কিন্তু তিনি অনুমতি প্রদান করেননি। উমারের (রা) আমলেও সে একই আবেদন করে। কিন্তু তিনিও অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। উসমানের আমলেও সে পুনরায় মদীনা ফিরে আসার আবেদন করে। লোকেরাও তার পক্ষে এই বলে সুপারিশ করে যে, সে এখন বৃদ্ধ, দুর্বল এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে, সুতরাং তাঁকে অনুমতি দিন। অতএব তিনি কেবল এতোটুকু অনুমতি দেন যে, প্রত্যেক জুমার দিন মদীনা এসে লোকদের কাছে যা যা চাওয়ার চেয়ে নিয়ে ফিরে চলে যাবে।

সেই সব শিশু যাদের এখনো নারীর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে বুঝ হয়নি

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষা হলো ঃ

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ

এর অর্থ সেই সব শিশু, যারা এতোটা কম বয়সের যে, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে কোনো বোধই তাদের এখনো উদয় হয়নি। কম বয়সের কারণে এখনো মহিলাদের রস-রসিকতা এবং বিশেষ ধরনের ভাবভঙ্গিমা বুঝেনা। এরূপ বালকদের আসা যাওয়া এবং

www.bjilibrary.com

তাদের থেকে পর্দা না করলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেসব বালক বয়প্রাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে, কিংবা তাদের মধ্যে বালিগ হবার চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়েছে, যারা নারীদের বিশেষ ধরনের কথা বার্তার অর্থ বুঝে এবং সুন্দরী অসুন্দরী মহিলার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, তাদের আসা যাওয়া এবং তাদের সামনে বেপর্দা থাকা উচিত হতে পারেনা।

www.bjilibrary.com

মাহরামদের সামনে সতরের সীমা

এ যাবতকার আলোচনা থেকে মাহরামদের পরিচয় তো পাওয়া গেলো। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, এই মাহরামদের সামনে একজন স্বাধীন সম্মানিত মুসলিম মহিলার সতরের সীমা কতটুকু?

এ প্রসঙ্গে একটি মত হলো, উপরে আলোচিত মাহরাম এবং মুসলিম মহিলাদের সামনে একজন নারীর জন্য তার যে অংশ ঢেকে রাখা (সতর করা) একান্ত অপরিহার্য, তাহলো হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত অংশ। এ মত অনুযায়ী মহিলারা তাদের মাহরামদের উপস্থিতিতে কিংবা একাকী তাদের হাটু থেকে নাভী পর্যন্তকার অংশ ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ খুলতে পারে।[১]

কিন্তু এ মতটি পুরাপুরি মেনে নেয়া যায়না। ইতিপূর্বে আমরা ইমাম কুরতুবীর সূত্রে একথা পরিষ্কার করে এসেছি যে, মানসিক অবস্থার তারতম্যের ভিত্তিতে মাহরামদের স্তরও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন মহিলা তার পিতা এবং ভাইয়ের সামনে যতোটা পর্দাহীন চলতে পারে, সতীনের ছেলের সামনে তার চাইতে অনেক বেশী সতর্ক হয়ে চলতে হয়। এসব পার্থক্যের ভিত্তিতে মহিলাদের শরীর খোলা রাখতে পারার এবং সতরের সীমার মধ্যেও তারতম্য আছে।

মালেকীদের মতে, পুরুষ মাহরামদের সামনে মহিলাদের পুরো শরীরই সতর। তবে মুখমণ্ডল এবং বহিরাঙ্গসমূহের কথা আলাদা। আর বহিরাংগ বলতে বুঝায় মাথা, ঘাড়, দু' হাত এবং দু' পা।

হাম্বলীদের মতে, মাহরামদের সামনে মহিলাদের সতর হলো, মুখমণ্ডল, ঘাড়, মাথা, দু' হাত, দু' পা এবং পায়ের গোঁছা ছাড়া বাকী গোটা দেহ।

১. আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া (চার মযহাবের ফিক্‌হ) পৃষ্ঠা ঃ ১০০, শায়াব সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

গায়রে মাহরামদের সামনে সতরের সীমা

গায়রে মাহরাম মানে–সমস্ত পরপুরুষ। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত সমস্ত মাহরাম এবং যাদের সাথে মহিলাদের চিরদিনের জন্য বিয়ে হারাম, তারা ছাড়া বাকী সবাই মহিলাদের গায়রে মাহরাম। যেসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হারাম নয়, তারাও গায়রে মাহরাম। এরূপ আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সমস্ত পুরুষই পর্দা ও সতরের দিক থেকে মহিলাদের জন্য সমান।

সুতরাং নিজ চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, দেবর, ভাসুর এবং স্বামীর চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই প্রভৃতির সাথে গায়রে মাহরাম পর পুরুষের মতোই পর্দা করতে হবে।

বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اياكم والد خول على النساء ، قالوا يارسول الله ! افرايت الحمو ؟ قال الحمو ، الموت –

"তোমরা (গায়রে মাহরাম) মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ দেবর তো মৃত্যু সমতুল্য।"

হাদীসে 'হামওয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হামওয়া মানে স্বামীর আপন ভাই এবং আত্মীয় ভাই উভয়টাই বুঝায়। হাদীসটির তাৎপর্য হলো, একজন মহিলার জন্য দেবর বা ভাসুরের সামনে পর্দা না করার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

এবার আসুন, গায়রে মাহরামদের সামনে মহিলাদের সতরের সীমা কি, সে বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ – (الاحزاب : ٥٣)

www.bjilibrary.com

"তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) থেকে কিছু চাইবে, পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য সর্বোত্তম পন্থা।" [আল আহযাব ঃ ৫৩]

এ আয়াতটির বিধান নাযিল হয়েছে মূলত নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে। আয়াতটির শানে নুযুল হলো ঃ একবার উমার ইবনে খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা)-কে বললেন ঃ আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করার নির্দেশ দেন তবে খুবই উত্তম হয়। কারণ তাঁদের কাছে ভালো মন্দ সব ধরনের লোকেরাই আসে। অতপর এরি প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, মুসলমানদের যদি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কিছু চাইতে হয়, কিংবা কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হয়, তবে তার অনুমতি আছে এবং তা অবশ্যি পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে বা জিজ্ঞেস করতে হবে। আর পর্দা করাকে অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ পুরুষের মনে নারী সম্পর্কে আর নারীর মনে পুরুষ সম্পর্কে যে কুচিন্তা সৃষ্টি হয়, তা থেকে কেবল পর্দা করার মাধ্যমেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া পর্দা শো'বা সন্দেহ এবং অপবাদ অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবারও এক বড় উপায়। যৌন জীবনকে হিফাযত করারও এটা সর্বোত্তম পন্থা।

এ আয়াত থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, পুরুষ বা নারী কারোরই নিজের সম্পর্কে এতোটা অটুট অবস্থা পোষণ করা উচিত নয় যে, নারী বা পুরুষের সাথে পর্দাহীন অবাধ মেলামেশা দ্বারা তার কোনো প্রকার নৈতিক অধপতন হবেনা। আসলে পর্দাহীন মেলামেশা থেকে বিরত থাকাই উত্তম পন্থা। আত্মরক্ষার উপায়। নিষ্পাপ পবিত্র জীবন যাপনের পথ।

আয়াতটির বিধান কেবলমাত্র উম্মুল মুমিনীনদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই। কারণ এখানে তো পর্দা করার উদ্দেশ্যও বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং একই উদ্দেশ্য লাভের জন্য তা সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য। নবীর (সা) পবিত্রা স্ত্রীগণ তো তাকওয়া পরহেযগারী এবং পূত পবিত্রতার দিক থেকে অন্য মহিলাদের তুলনায়

www.bjilibrary.com

ছিলেন অনেক উর্ধে। সুন্দরতম মহামানব মহানবী (সা)-কে স্বামী হিসেবে পেয়ে হয়েছিলেন পূর্ণ পরিতুষ্ট। তারপরও তাঁদের জন্য এরূপ পর্দা পদ্ধতি ফরয করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁদের পবিত্রতার জন্যে যে পর্দার ব্যবস্থা ফরয করে দেয়া হয়েছে, অন্যসব মুমিন মহিলাদের জন্যও তা ফরয হওয়া তো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের জন্য তো এ ব্যবস্থা বরং অধিকতর জরুরী।

কুরআন এখানে সাহাবায়ে কিরামকেও (রা) জড়িয়ে কথা বলেছে। পর্দার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এভাবে উম্মুল মুমিনীন এবং সাহাবীগণের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা পাবে। এখন কথা হলো সাহাবীগণতো ছিলেন পৃথিবীর সেরা মানব দল। তাকওয়া, পরহেযগারী ও পূত পবিত্রতার দিক থেকে তাদের সমতুল্য কোনো মানব দল আর কখনো পৃথিবীতে আসবেনা। স্বয়ং কুরআন তাদের চরিত্রগুণের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। সুতরাং তাঁদের পবিত্রতার উদ্দেশ্যে যদি মহিলাদের পর্দা করা জরুরী হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে তাঁদের পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে তো এটা আরো অনেক গুণ অধিক প্রয়োজন। এ কারণেই এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতবী লিখেছেন :

"এই হুকুমটি সাধারণভাবে সমস্ত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। মহিলাদের গোটা শরীরই যে সতর (ঢেকে রাখার বস্তু) সেই মূলনীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহিলাদের কণ্ঠস্বরও সতর। সুতরাং একান্ত জরুরত ছাড়া পরপুরুষকে কণ্ঠস্বর শুনানোও জায়েয নয়। যেমন সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজনে, ডাক্তার দেখার প্রয়োজনে কিংবা কোনো জরুরী প্রয়োজনে কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা বা জিজ্ঞাসার জবাব দেবার জন্য কথা বলা বা শোনা বা অংগ দেখানো জায়েয।

তাই যারা এ আয়াতের বিধান কেবল উম্মুল মুমিনীনগণের জন্য নির্দিষ্ট করে, তারা মূলত পর্দার বিধান ফরয করার উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেনি। কুরআন সুস্পষ্টভাবে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরের পবিত্রতার উদ্দেশ্যও বলে দিয়েছে। আর তাঁদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য যদি মহিলাদের পর্দা করা জরুরী হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জন্য তো তা হাজারো গুণ বেশী প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

আসলে এখানে উম্মুল মুমিনীনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে এ জন্য যে, তারাই মুমিন নারীদের মডেল এবং নেত্রী ছিলেন। তাই তাঁদের সম্বোধন করে কোনো হুকুম নাযিল হলে তা গোটা মুসলিম নারী সমাজের জন্যই প্রযোজ্য।"

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ – (النور : ٣١)

"আর মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে চলে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর যেন তারা নিজেদের বক্ষ– দেশের উপর ওড়না ফেলে রাখে।" [আন নূর ঃ ৩১]

এ সূরায় পবিত্রতা রক্ষা এবং সতরের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উমার (রা) কূফাবাসীদের জন্য এ ফরমান (বা নির্দেশ) পাঠান ঃ

"তোমরা নিজেদের মহিলাদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও।"

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ "তোমরা নিজেদের মহিলাদের সূরা নূর এবং সূতা কাটা শেখাও।'

উপরের আয়াতটিতে প্রথমেই চোখ বাঁচিয়ে চলতে বলা হয়েছে। তারপরে লজ্জাস্থানের হিফাযতের কথা বলা হয়েছে। লজ্জাস্থানের হিফাযতের পূর্বে চোখ বাঁচানোর কথা বলার কারণ হলো, 'চোখ মনের গোয়েন্দা'। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

النظرة سهم من سهام ابليس مسموم فمن غض البصر اورثه الله الحلاوة فى قلبه –

"দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি। সুতরাং যে নিজের চোখ বাঁচালো, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ঈমানের স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।"

www.bjilibrary.com

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى ، ادرك ذلك لامحالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر –

"আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের তকদীরে কোনো না কোনো প্রকারের যিনার অংশ লিখে রেখেছেন, যা অবশ্যি সে লাভ করবে। তার চোখও যিনা করে। আর চোখের যিনা হলো দৃষ্টি।"

ইমাম তিরমিযী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার (রা) মুক্ত দাস নাবহানের (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তাঁর নিকট তাঁর দুজন পবিত্রা স্ত্রী উম্মে সালামা এবং মাইমুনা (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের বললেন ঃ 'পর্দা করে নাও।'

তারা বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তো অন্ধ।' অপর একটি হাদীসের বর্ণনা এরূপ যে, তারা বললেন ঃ "আবদুল্লাহ তো অন্ধ, আমাদের দেখতে পাবেনা।"

তাদের বক্তব্য শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ "তোমরাও কি অন্ধ? তোমরাও কি তাকে দেখতে পাবে না?"

আলোচ্য আয়াতটিতে 'চোখ বাঁচানো' এবং 'লজ্জাস্থানের হিফাযত' ছাড়াও আরেকটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। তাহলো, এমনিতে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাছাড়া নিজের সাজগোজ এবং রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা।

মুকাতিল এবং ইবনে হাব্বানের মতে আয়াতটির শানে নুযূল হলো ঃ আসমা বিনতে মারছাদ (রা) তাঁর গোত্রের একটি ঘরে থাকতেন। মহিলারা তহবন্দ না পরেই তাঁর কাছে আসতে শুরু করে, যার ফলে তাদের পদালংকার চুল ও সীনার কিনারা স্পষ্ট দেখা যেতো। এ অবস্থা দেখে আসমা (রা) তাদের বললেন ঃ 'এদের চালচলন কতইনা খারাপ!' এরি প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এখন প্রশ্ন হলো, 'তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে' সেই সাজ সৌন্দর্য বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতে এর অর্থ হলো চাদর এবং কাপড়। অর্থাৎ মহিলারা উপরিভাগে যে চাদর, ওড়না এবং বোরকা পরিধান করে তা। কারণ এগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)–এর মতে এর অর্থ মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও আংটি।

আল্লামা ইবনে কাসীর ইবনে আব্বাসের (রা) এই মতটি সম্পর্কে লিখেছেন, এই সম্ভাবনাও আছে যে, এর দ্বারা ইবনে আব্বাস (রা) সেই সব সৌন্দর্যই বুঝিয়েছেন, মহিলাদেরকে যেগুলো প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্ভবত তিনি বলেছেন, মুখমণ্ডল এবং আংটি প্রকাশ করা যাবেনা।

অবশ্য অধিকাংশ ফকীহর মতে 'তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে' বাক্যাংশের অর্থ মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয়। এঁরা তাদের মতের সপক্ষে একটি হাদীস পেশ করেন। আবু দাউদ খালিদ বিন দারীকের সূত্রে হযরত আয়েশা(রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আসমা বিনতে আবু বকর (রা) চিকন পাতলা কাপড় পরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসেন। তিনি তাকে দেখে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ঃ

يا اسماء ! ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى

منها الا هذا ... ... واشار الى وجهه وكفيه –

"হে আসমা! মেয়েরা যখন মাসিক হবার বয়সে উপনীত হয় (অর্থাৎ বালিগ হয়), তখন শরীরের কোনো অংশ দেখা যাওয়া ঠিক নয়। তবে এই এই অংশের কথা আলাদা। এ কথা বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয়ের প্রতি ইংগিত করেন।" [আবু দাউদ, চতুর্থ খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর ৪১০৪]।

www.bjilibrary.com

অবশ্য আবু দাউদ এবং আবু হাতেম রাযী লিখেছেন, এই হাদীসটি মুরসাল।[১] কেননা, খালিদ বিন দারীক নিজে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি শুনেননি।[২] কিন্তু এই মতের ফকীহগণ এটাকে কোনো দোষ মনে করেননা। তারা বলেন, কোনো হাদীস মুরসাল হলেই তার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েনা। যাক, বিষয়টি আল্লাহই অধিক জানেন।

ইবনে আতিয়া (র) লিখেছেন, আয়াতটির যে মর্ম আমি উপলব্ধি করেছি, তাহলো, মহিলাদের উপর এই হুকুম বর্তিয়েছে যে, তারা নিজেদের সাজগোজ ও রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করবেনা। তারা নিজেদের এমন প্রত্যেকটি জিনিস লুকিয়ে রাখবে যার ক্ষেত্রে 'সৌন্দর্য' (যীনত) কথাটি প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম কেবল এতোটুকু যে, মহিলারা চলাফেরা এবং জরুরী কাজ কর্মের জন্য আসা যাওয়া করতে স্বাভাবিকভাবে যতোটুকু এমনিতেই প্রকাশ হয়। এভাবে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে যতোটুকু এমনিতেই প্রকাশ পায়, সেটুকুর জন্য তারা ক্ষমা পাবে।

আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন, যেহেতু মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ইবাদতের সময়ও খোলা থাকে অর্থাৎ নামায এবং হজ্জে, সেহেতু 'যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে' দ্বারা মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় অর্থ গ্রহণ করা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মোট কথা এ প্রসঙ্গে উম্মতের আলিমগণের দু'টি মত রয়েছে ঃ

(১) একটি মত হলো, মহিলাদের মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত পুরো শরীরই সতর। সুতরাং পরিধেয় বস্ত্রের বহিরাংগ ছাড়া আর কিছুই পর পুরুষের সামনে প্রকাশ করা জায়েয নয়।

(২) আর দ্বিতীয় মতে, মহিলারা পর পুরুষের সামনেও মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় খোলা রাখতে পারে।

---

১. যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজে যার কাছ থেকে হাদীসটি শুনলেন, তার নাম উল্লেখ না করে সরাসরি মূল বর্ণনাকারীর নামে হাদীস বর্ণনা করেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুরসাল বলা হয়।

২. তাফসীরে কুরতুবী, ১২শ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখা

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষা হলো ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"আর তারা যেনো অবশ্যি নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে।"

বুক এবং গলা ঢেকে রাখা মহিলাদের জন্য ওয়াজিব। কেননা, এ আয়াতে তাকীদ করে এগুলো ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে।

জাহেলী যুগে আরবের মেয়েরা মাথায় ওড়না পরলেও ওড়নার আঁচল পিঠের দিকে ফেলে রাখতো। ফলে ঘাড়, গলা, কান, বুক প্রভৃতি থাকতো খোলা। এরি প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ওড়নার আঁচল দিয়ে বুক ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর কন্যা যয়নব (রা)

হারেছ বিন হারেছ আল গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা মিনায় অবস্থানকালে এক স্থানে লোকদের কোলাহল দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "বাবা! এখানে কোলাহল কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'এখানে লোকেরা এমন এক ব্যক্তির চারপাশে জড়ো হয়েছে, যে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করছে।' হারেছ বলেন, অতপর আমরা সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি লোকদের আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাওহীদের দিকে ডাকছেন। আর লোকেরা তাকে নিয়ে পরিহাস করছে এবং তাকে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে। এভাবে দুপুর হয়ে গেলো। অতপর লোকেরা আস্তে আস্তে যার যার পথে চলে গেলো। তখন একজন মহিলা এলেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি পানির পেয়ালা আর একটি রুমাল। তাঁর জামার বুকের বোতাম ছিল খোলা। তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। মুহাম্মদ (সা) তাঁর হাত থেকে পানির পেয়ালা নিয়ে পানি পান করলেন এবং অযু করলেন। অতপর মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মা, ওড়না দিয়ে বুক ঢেকে নাও। লোকেরা তোমার পিতাকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবে এমন ভয় পেয়োনা।

www.bjilibrary.com

হারেছ বলেন, আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটি কে? তারা বললো, তারই কন্যা যয়নব।[১]

মুহাজির মহিলাগণ

ইমাম বুখারী আয়েশার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ সেইসব প্রথম মুহাজির মহিলাদের প্রতি তাঁর রহমত নাযিল করুন, যাদের ঈমান ছিলো এতোটা উঁচু যে, যখন "তাঁরা যেন অবশ্যি তাদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে" আয়াতটি নাযিল হলো, তখন তাঁরা নিজেদের তহবন্দ (শাড়ী জাতীয়) ছিঁড়ে দুই ভাগ করে নেন এবং একভাগ দিয়ে ওড়না বানিয়ে মাথার উপর থেকে বুকের দিকে ঝুলিয়ে দেন।

আনসার মহিলাগণ

সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ এতে সন্দেহ নেই যে, কুরায়েশ মহিলাদের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। কিন্তু, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কিতাবকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে আমি আনসার মহিলাদের চাইতে অগ্রগামী কাউকেও দেখিনি। যখন সূরা নূরের এই আয়াতটি নাযিল হয় "আর তারা যেন নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে।" আর পুরুষরা যখন আয়াতটি সাথে করে ঘরে ফিরে গেলো এবং স্ত্রী কন্যা, বোন, অন্য কোনো আত্মীয়া মোট কথা যাকেই আল্লাহর এই হুকুমটি পড়ে শুনিয়েছে, তখন তাদের মধ্যে এমন একজন মহিলাও ছিলেননা, যিনি নিজের পিঠের চাদর দ্বিখন্ডিত করে ওড়না বানাননি এবং তা মাথার উপর থেকে বুকের দিকে ঝুলিয়ে দেননি। তাদের এ অবস্থাটা ছিল, আল্লাহর বিধানের উপর ঈমান আনা এবং তা স্বীকার করে নেয়ার আদর্শ নমুনা। পরদিন সকালে মহিলারা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন তাদের সকলের মাথায়ই ওড়না ছিলো। মনে হচ্ছিল, তাদের মাথায় কাক বসে আছে।

---

১. হাদীসটি তাবরানী তাঁর মু'জামুল কবীর (১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ), ইবনে আসাকির দামেস্কের ইতিহাস গ্রন্থে এবং বুখারী তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সূত্রের দিক থেকে হাসান।

www.bjilibrary.com

ফকীহদের মতামত

উপরে আলোচিত আয়াত এবং হাদীস· থেকে গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে মহিলাদের সতরের ধরন স্পষ্ট হয়েছে। ইমাম শাওকানী তাঁর "নাইলুল আওতার' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "স্বাধীন মহিলাদের সতরের সীমার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মততেদ আছে" ঃ

• একটি মত অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় ছাড়া মহিলাদের গোটা শরীরই আওরত বা সতরযোগ্য। এ মত আলহাদী (র)–এর। আল কাসিম–এর দু'টি মতের একটিও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ীর কয়েকটি মতের মধ্যে একটি অনুরূপ। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফার যেসব মতামত উল্লেখ হয়েছে তন্মধ্যেও একটি অনুরূপ। ইমাম মালিকেরও এই একই মত।

• দ্বিতীয় মত হলো ঃ মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, পায়ের পাতা এবং পদালংকার পরার স্থান সতর নয়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী এটা ইমাম আবু হানীফা এবং আল কাসিম–এর মত। সুফিয়ান সওরী এবং ইবনে তাইমিয়ার মতও অনুরূপ।

• তৃতীয় মত হলো ঃ মুখমণ্ডল ছাড়া মহিলাদের পুরো শরীরই আওরত বা সতরযোগ্য। এটি হলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম দাউদ যাহেরীর মত।

• আর চতুর্থ মতটি হলো ঃ "মহিলাদের পূর্ণাংগ শরীরই সতর। কোনো প্রকার ব্যতিক্রম নাই। এ হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর কোনো কোনো ছাত্রের মত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একটি মতও অনুরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে।"

ফিক্‌হী মতামতের সারকথা

মাসআলাটির ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মতামতের সারকথা হলো ঃ

• **হানাফী মযহাব ঃ** মহিলাদের জন্য গায়রে মাহরামদের সামনে মুখমণ্ডল এবং হাত খোলা রাখা জায়েয। তবে পুরুষদের জন্য কামনার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকানো জায়েয নয়।

www.bjilibrary.com

● **মালিকী মযহাব ঃ** এ প্রসঙ্গে মালিকী মযহাবের মত একাধিক ঃ

১. মুখমণ্ডল এবং হাত ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এ মতটিই খ্যাতিলাভ করেছে।

২. মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয় বটে, তবে পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নীচু রাখা জরুরী।

৩. সুন্দরী এবং অসুন্দরী মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। সুন্দরীদের জন্য মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর কুশ্রী মহিলাদের জন্য ওয়জিব নয়, মুস্তাহাব।

● **শাফেয়ী মযহাব ঃ** যদিও এ মযহাবের অধিকাংশ আলিমের মতে মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ফতোয়া দেয়া হয়েছে ওয়াজিব হবার পক্ষে।

● **হাম্বলী মযহাব ঃ** মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয়সহ পুরো শরীরের সতর করা জরুরী।

কিন্তু এই সতর করা বা না করার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে যে মতপার্থক্য তা সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর অসুন্দরের ভিত্তিতে। যে মহিলা সাজসজ্জা করেনি, স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, এমন সুন্দরীও নয় যে, তাকে দেখে কেউ কুদৃষ্টি দেবে এবং ফিতনায় পড়ার কোনো আশংকা নেই; যারা মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় ঢাকা জরুরী নয় বলে মনে করেন। কেবল এইসব অবস্থায়ই তারা তা মনে করেন।

কিন্তু তার অবস্থা যদি সেরূপ না হয়, অর্থাৎ সে যদি সুন্দরী হয়ে থাকে এবং সাজগোজ করে থাকে, তবে সকলের মতেই সতর করা ওয়াজিব, যাতে করে মহিলা উত্যক্ত হওয়া থেকে এবং পুরুষ ফিতনায় পড়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ফলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে, মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় সতর নয়, তবে সতর করাই উত্তম। কিন্তু পরিবেশ যদি এমন হয় যে, উত্যক্ত হবার আশংকা আছে, তবে সে অবস্থায় সকলের মতেই সতর করা জরুরী।

www.bjilibrary.com

এ যাবত এ প্রসঙ্গে যে মতপার্থক্য আলোচিত হলো, তা সৃষ্টি হয়েছে "তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবেনা, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে" আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় এই মতপার্থক্য করার অবকাশ থাকার প্রেক্ষিতে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ - (النور : ٣١)

"তারা যেন নিজেদের 'যীনত' বা সাজ-সৌন্দর্য উন্মুক্ত না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তাছাড়া আর তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়না ফেলে রাখে। এছাড়া তারা যেন নিম্নোক্ত লোকদের ছাড়া আর কারো সামনে নিজেদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে ঃ তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা...."

[সূরা আন নূর ঃ ৩১]

ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি উল্লেখ করেছি ঃ "হে আদম সন্তানরা! প্রত্যেক ইবাদতের সময় তোমরা নিজেদের যীনত দ্বারা ভূষিত হও।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা এই কথা পরিষ্কার করে এসেছি যে, 'যীনত' মানে দেহের সেইসব অংগ, যেগুলো ঢেকে রাখা অপরিহার্য। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, পোষাক বা বস্ত্র ছাড়া গোপন অংগ ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। একথাও আলোচিত হয়েছে যে, একজন মহিলাকে নামাযে এবং নামাযের বাইরে মাহরাম এবং অমাহরামদের সামনে শরীরের কোন্ কোন্ অংশ ঢেকে রাখতে হবে এবং কোন্ কোন্ অংশ খোলা রাখার অনুমতি আছে। তাছাড়া একথাও আলোচনা করে এসেছি যে, একজন মহিলাকে নামাযে কোন্ ধরনের পোশাক পরিধান করা উচিত।

এবার আমরা সাধারণভাবে মহিলারা নামাযের বাইরে যেসব পোশাক পরিধান করে থাকে তার ধরন ও শর্তাবলী আলোচনা করবো। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ (الاحزاب : ٥٩)

"হে নবী। তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিনদের মহিলাদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের উপর তাদের জিলবাব ঝুলিয়ে দেয়। এটা খুবই উত্তম নিয়মরীতি, যাতে করে তাদের (সম্ভ্রমশীলতা) চিনতে পারা যায় এবং তাদের উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"
[আল আহযাব ঃ ৫৯]

এ আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট হলো, সেকালে আরব মহিলারা বিকৃত ধরনের চলাফেরা করতো। তারা জামার বক্ষদেশের অংশ খোলা রেখে বেড়াতো। ফলে পুরুষরা তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো সেই নারীদের সম্পর্কে কুচিন্তায় লিপ্ত হতো। তাই আল্লাহ নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মহিলাদেরকে এই শিক্ষা দেন যে, তারা যখন ঘর থেকে বেরুবার নিয়্যত করবে, তখন যেন তারা নিজেদের চাদরের আঁচল মাথার উপর থেকে নিচের দিকে বক্ষদেশের উপর ঝুলিয়ে দেয়। এতে করে স্বাধীন মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হবে। তাদের আবরণের প্রেক্ষিতে তাদের পরিচয় স্পষ্ট হবে। এর ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।

এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বে মুমিন মহিলারা যখন কোনো প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতো, তখন বদমাশরা তাদেরকে দাসী মনে করে উত্যক্ত করতো। তারা চীৎকার করে উঠলে বদমাশরা পালিয়ে যেতো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিষয়টি নবী করীমকে (সা) জানালে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

জিলবাব

উপরোল্লেখিত আয়াতটিতে 'জালাবীব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। জালাবীব জিলবাবের বহুবচন। এর অর্থ সেই চাদর, যা পোশাকের উপরিভাগে উড়িয়ে রাখা এবং ঝুলিয়ে দেয়া হয়। জিলবাব সাধারণ

ওড়না থেকে বড় হয়ে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জিলবাবের অর্থ করেছেন বড় চাদর। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ এভাবে করতে পারি ঃ "আর তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের উপর চাদর ঝুলিয়ে দেয়।"

অপর একটি মতে জিলবাব হলো সেই কাপড় যা গোটা শরীর ঢেকে রাখে। নিজেদের উপর জিলবাব ঝুলিয়ে দেবার ধরন সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে।

● হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং উবায়েদ সালমানী (র)–এর মতে মহিলারা নিজেদের পুরো শরীর চাদর দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে নেবে যে, কেবল দেখার জন্য একটি চোখ ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে থাকবে। আর কিছু খোলা থাকবেনা।

● হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রা)–এর অপর একটি মত হলো, চাদর এমনভাবে শরীরে জড়িয়ে নিতে হবে যে, প্রথমে এর একটি অংশ দ্বারা কপালসহ মাথায় বেঁধে নেবে। অতপর বাকী অংশ শরীরের উপরিভাগে জড়িয়ে নেবে যা নাকের আগা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে। এতে কেবল চোখ দু'টি খোলা থাকবে। কিন্তু বক্ষদেশ এবং মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিরাট অংশ আচ্ছাদিত হবে। এটি কাতাদা (র)–এরও মত।

● হাসান বসরী (র) বলেছেন, জিলবাব এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যাতে মুখমণ্ডলের অধিকাংশ ঢেকে যায়।

জিলবাব কেমন হওয়া উচিত?

জিলবাব কি ধরনের হওয়া উচিত? শাইখ মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন আলবানী তাঁর বিখ্যাত 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ্ ফিল কিতাব ওয়াস্‌সুন্নাহ' গ্রন্থে জিলবাবের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

১. জিলবাব এমন হতে হবে, যা নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশ ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে রাখার মতো হবে।

২. এতোটা সৌন্দর্য মণ্ডিত যেন না হয় যে, চাদর নিজেই যীনত হয়ে বসে।

www.bjilibrary.com

৩. তা মোটা বা নিবিড় বুননের কাপড় হতে হবে, যাতে করে তার ভেতরের বস্ত্র বা দেহ পরিলক্ষিত না হয়।

৪. তা ঢিলেঢালা হওয়া উচিত। এমন আঁটসাঁট যেন না হয়, যাতে শরীরের গঠন প্রকৃতি পরিলক্ষিত হবে।

৫. তা যেন সুগন্ধি লাগানো না হয়। অর্থাৎ চলাফেরার সময় তা থেকে যেন সুগন্ধি না ছড়ায়।

৬. তা যেন পুরুষালি ধরনের না হয়।

৭. তা যেন কাফির নারীদের পোশাকের মতো না হয়।

৮. তা যেন এতোটা ব্যতিক্রমধর্মী এবং জাঁকজমকপূর্ণ না হয় যা খ্যাতিলাভ করার মত।

এই আটটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবার কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

(১) তা এমন হবে যা নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশ ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে রাখবে।

আমরা আগেই বলেছি, অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে মুখমণ্ডল এবং হাত অপরিহার্য সতরের অঙ্গ নয়। তাই পুরো শরীর চাদর দ্বারা জড়ানোর ব্যাপারে এ দু'টি ব্যতিক্রম। তাছাড়া সেই বাহ্যিক বস্ত্রও এর ব্যতিক্রম যা চাদর দিয়ে জড়ানো সম্ভব নয়।

(২) এতোটা সুন্দর হবেনা যে, স্বয়ং চাদরই যীনত হয়ে বসবে। এই শর্তটির ভিত্তি হলো আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ 'পূর্বের জাহেলিয়াতের মতো সাজগোজ প্রদর্শন করে বেড়াবেনা।' [সূরা আহযাব ঃ ৩৩]

ইমাম যাহাবী তাঁর 'আল কাবায়ির' গ্রন্থে লিখেছেন, যেসব কারণে নারীরা অপরাধী-অভিশপ্ত হবে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও রয়েছে ঃ

বস্ত্রের ভেতর দিয়ে অলংকারাদি প্রদর্শিত হওয়া, ঘর থেকে বেরুবার সময় উগ্র সুগন্ধি ব্যবহার করা, রং ঢং-এর কাপড় চোপড় পরে বের হওয়া, টাইটফিট জামা কাপড় পরা, পরিধেয় বস্ত্র যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত

www.bjilibrary.com

করে মাটির উপর দিয়ে টেনে টেনে চলা প্রভৃতি কাজ কুরআনে বর্ণিত 'তাবাররুজ' বা জাহেলী সাজগোজ প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কাজ আল্লাহর অত্যন্ত অপসন্দনীয়। এ রকম চালচলনে নারীদের প্রতি আল্লাহ ইহকাল ও পরকালে নারাজ হন। এরূপ চালচলনের নারীদের ব্যাপারেই আল্লাহর নবী (সা) বলেছেন ঃ

اطلعت على النار فرايت اكثر اهلها من النساء

"আমাকে দোযখ দেখানো হয়। আমি দেখেছি অধিকাংশ দোযখবাসী নারী।"

(৩) মোটা এবং ঘনবুননের কাপড় হতে হবে, যাতে করে ভেতরের বস্ত্র এবং শরীর দেখা না যায়।

এটা একটা জরুরী শর্ত। কারণ, হালকা পাতলা কাপড় দ্বারা সতরের উদ্দেশ্য হাসিল হয়না। বরঞ্চ তা নারীদেরকে আরো অধিক ফিতনার দিকে ঠেলে দেয়। এক রাত্রে স্বপ্ন দেখে নিদ্রা ভংগ হবার পর নবী করীম (সা) বলেছিলেন ঃ

سبحان اللّه ماذا انزل الليلة من الفتن ؟ وماذا فتح من الخزائن ؟ من يوقظ صواحب الحجر ؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الاخرة – (بخارى)

"সুবহানাল্লাহ! আজ রাত কত কত ফিতনা নাযিল হয়েছে! কত কত কোষাগার খোলা হয়েছে! ঘরবাসিনীদের সজাগ করবার কেউ আছে কি? এ জগতের অনেক বস্ত্র পরিধানকারীনী পরকালে নগ্ন থাকবে।"
[বুখারী]

এছাড়া সহীহ সনদের সাথে তাবারানী 'মু'জিমুস সগীর' গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ

سيكون فى امتى نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كاسنمة البخت ، العنوهن فانهن ملعونات –

www.bjilibrary.com

"অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমনসব নারীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা কাপড় পরেও নগ্ন থাকবে। তাদের মাথা হবে উটের পিঠের কুঁজের মতো। তাদেরকে অভিশাপ দাও। কারণ তারা অভিশপ্ত।"

এসব মহিলাদের সম্পর্কে বুখারীর আরেকটি হাদীসের বক্তব্য হলো ঃ

لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذاوكذا –

"এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবেনা। অথচ অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত জান্নাতের সৌরভ ছড়িয়ে পড়বে।"

একবার আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের কন্যা হাফসা একটি পাতলা দোপাট্টা মাথায় জড়িয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা) কাছে আসেন। কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার কপাল দেখা যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে আয়েশা (রা) তার দোপাট্টাটি ছিঁড়ে ফেলে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সূরা নূরে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা কি তুমি জান না? অতপর তিনি আরেকটি দোপাট্টা চেয়ে পাঠান এবং সেটা তার মাথায় জড়িয়ে দেন। [ইবনে সাআদ]

অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, একবার বনী তামীমের কতিপয় মহিলা পাতলা কাপড় পরে তাঁর কাছে আসে। তাদের দেখে হযরত আয়েশা(রা) বলেন ঃ তোমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকো, তবে এগুলো মুসলমানের পোশাক নয়। আর যদি অমুসলিম হয়ে থাকো তবে অন্য কথা।

(৪) চাদরটি ঢিলাঢালা করে পরতে হবে, আঁটসাঁট করে নয়। এটাও একটি জরুরী শর্ত। কেননা, পোশাক পরার উদ্দেশ্য তো হলো ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা। আর ঢিলাঢালা পোশাক দ্বারাই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। আঁটসাঁট পোশাক পরলে তো গোটা দেহ এবং দেহের গঠন প্রকৃতি পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়।

www.bjilibrary.com

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, দেহ্‌ইয়া কালবী (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) যে কাপড়গুলো হাদিয়া দিয়েছিলেন, সেখান থেকে একটি গাঢ় কাতানী কাপড় তিনি আমাকে প্রদান করেন। আমি সে কাপড়টি আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিই। পরে সে কাপড়টি আমাকে পরতে না দেখে তিনি বলেছিলেন :

'কি হলো, কাতানী কাপড়টি তুমি পরছনা কেন? আমি বললাম, আমি সেটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন : "তাকে বলবে, তার নিচে যেন অবশ্যি অন্য কাপড় পরে নেয়। কারণ আমার আশংকো হচ্ছে শুধু এটা পরলে তার শরীরের গঠন প্রকৃতি পরিলক্ষিত হবে।" জিয়াউল মাকদাসী তাঁর 'আল আহাদীসুল মুখতারা' এবং ইমাম আহমদ ও বায়হাকী হাসান সনদসহ হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, দেহ্‌ইয়া কালবী যখন রাসূলুল্লাহর দূত হিসেবে সম্রাট হেরাকল এর নিকট থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাকে একটি কাতানী কাপড় প্রদান করে বলেন : "এটি দু'টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে তুমি জামা তৈরী করবে আর অপর টুকরা ওড়না হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তোমার স্ত্রীকে দেবে।' অতপর বললেন : "তাকে বলবে, এর নিচে যেন অবশ্যি অন্য কাপড় পরে নেয়, যাতে করে শরীরের গঠন বুনন দেখা না যায়।"

হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণিত। মুন্‌যির ইবনে যুবায়ের ইরাক থেকে ফিরে এসে আসমা বিনতে আবু বকরের (রা) নিকট যান। তিনি তাঁকে মরু অঞ্চলের এক জোড়া কোহেস্তানী পাতলা কাপড় প্রদান করেন। এ সময় হযরত আসমার দৃষ্টিশক্তি ছিলনা। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কাপড়গুলো হাতে ছুঁয়ে দেখে বলে দেন : "ওহ্ কাপড়গুলো তাকে ফেরত দাও।" এতে মুনযিরের মনে দারুণ কষ্ট হয়। তিনি বললেন, 'মা, এ কাপড় তো স্বচ্ছ নয়।' তিনি বললেন : স্বচ্ছ নয়, কিন্তু শরীরের গঠন দেখিয়ে দিতে পারে। [ইবনে সায়াদ]

বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে আবী সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার উমার (রা) জনগণের মধ্যে কাতানী কাপড় বিতরণ করেন। বিতরণের পর তিনি তাদের বলেন : 'কাপড়গুলো তোমাদের স্ত্রীরা যেন না নেয়।' এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : "আমীরুল মুমিনীন! আমি

www.bjilibrary.com

আমার স্ত্রীকে একবার এ কাপড় পরিয়ে দেখেছি। সে এ কাপড় পরে ঘরে চলাফেরা করে। আমি সামনে পিছে থেকে দেখেছি। আমার মনে হয় এটা পাতলা সূক্ষ্ম কাপড় নয়।" তার বক্তব্য শুনে খলীফা বলে উঠলেন ঃ 'সূক্ষ্ম না হলেও এ কাপড় পরলে শরীরের বুনন পরিলক্ষিত হয়।'

(৫) তা যেন পুরুষালি পোশাকের মতো না হয়। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদীসই বর্তমান রয়েছে। যারা পুরুষের মতো পোশাক পরে তারা অভিশপ্ত। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) সেই পুরুষকে অবিসম্পাত করেছেন, যে মেয়েলী পোষাক পরে এবং নারীকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষালী পোষাক পরে। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকিম, মুসনাদে আহমদ। হাদীস বিশুদ্ধ হবার জন্য ইমাম মুসলিম যেসব শর্তারোপ করেছেন, সে অনুযায়ী এটি বিশুদ্ধ সহীহ হাদীস]

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال - (مسند احمد)

"সেই নারী আমাদের দলভুক্ত নয়, যে পুরুষালী পোশাক পরে এবং সেই পুরুষও আমাদের দলভুক্ত নয় যে মেয়েলী পোশাক পরে।"

[মুসনাদে আহমদ]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই পুরুষদের অভিসম্পাত দিয়েছেন যারা হিজড়া হবার ভান করে। আরো অভিসম্পাত দিয়েছেন সেইসব নারীদের যারা পুরুষ পুরুষ সাজে। প্রসংঙ্গক্রমে তিনি এদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতেও বলেছেন। [বুখারী, আবু দাউদ, দারেমী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ]।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, যেসব মেয়েরা পাতলুন পরে, তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

কোনো কোনো আলিমের মতে পাতলুন পরা হারাম। উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু আমার মতে এ ব্যাপারে ঢালাওভাবে কোন কথা বলে দেয়া ঠিক নয়। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। দেখতে হবে, কোন্ মহিলা সংকীর্ণ পাতলুন এবং ছোট ব্লাউজ বা জেকেট পরে? আর কোন্ মহিলা পাতলুনের উপর লম্বা কোট, লম্বা জেকেট বা বড় চাদর পরে? এ দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। কারণ এমতাবস্থায় কেবল একজনের অবস্থাই না সূচক হবে।

আমাদের এ মতের ভিত্তি হলো এই যে, নিষেধ তো করা হয়েছে এমন সাদৃশ্যকে যাতে নিজেকে পুরুষের মতো প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকবে।

কোনো মহিলা যদি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যেমন ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য চোগা বা চামড়ার পোশাক পরে, তবে এমতাবস্থায় তো তাকে এরূপ পোশাক পরা থেকে নিষেধ করা যেতে পারেনা। কারণ তার উদ্দেশ্য তো নিজেকে পুরুষের মতো প্রকাশ করা বা সাদৃশ সৃষ্টি করা নয়।

একইভাবে কোনো মহিলা যদি সেলোয়ার পরে উপরে জিলবাব (বড় চাদর) জড়িয়ে নেয়, তবে তা হারামও নয়, মাকরূহও নয়। কারণ, সে মহিলা পূর্ণভাবে সতর করেছে।

তবে, অভ্যাস ও চালচলনের পার্থক্য এবং স্থান কাল পরিবর্তন হবার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার হুকুম পরিবর্তন হতে পারে। এ ব্যাপারে আসল কথা হলো সতরের অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণ ও মার্জিত রূপে আচ্ছাদিত রাখা। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে পন্থা পদ্ধতির বিভিন্নতায় কিছু যায় আসেনা।

সুতরাং যেসব মহিলা ও বালিকা পাতলুন পরিধান করে এবং তার উপর লম্বা জেকেট, কোট বা বড় চাদর জড়িয়ে নেয়, তাদের জন্য পাতলুন পরা নিষেধ নয়। তবে, শর্ত হলো এই উপরে পরার কাপড়গুলো এমন আঁটসাঁট হবেনা যাতে দেহের বুনন পরিলক্ষিত হবে। এতোটা সূক্ষ্ম হবেনা যাতে শরীরের ঝলক দেখা যেতে পারে। তার মধ্যে নিজেকে পুরুষ সদৃশ করবার বা পুরুষ সাজবার বাসনা থাকবেনা। বরঞ্চ শরীর ঢাকাই হবে তার উদ্দেশ্য।

www.bjilibrary.com

সারকথা হলো, মেয়েদের জন্য পুরুষালি অলংকার, পোশাক এবং পুরুষের মতো করে নিজেকে সাজানো নিষিদ্ধ।

ইসলামের ইতিহাস থেকে এমন কোনো প্রমাণ মেলে না যে, মুসলমান কোনো দেশ বা অঞ্চল জয় করার পর সেখানকার অধিবাসীদের পোষাক পরিবর্তন করে দিয়েছে। বরঞ্চ পরিবর্তন করেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চালচলন। তাদের পোষাক আশাক পাল্টে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ পোষাক তৈরী ও পরিধানের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়া হয়েছে।

পাতলুন মূলত এক প্রকার পায়জামা। তাই এটা স্বয়ং হারাম বা মাকরূহ হতে পারেনা। ইমাম শা'রানী (র) তাঁর 'কাশফুল গুম্মাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, নবী করীম (সা) সেলোয়ার এবং পায়জামা পরতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা আহলি কিতাবের বিপরীত করো। তারা সেলোয়ার এবং পায়জামা পরেনা, তোমরা পরো।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "তোমরা সেলোয়ার পরো মেয়েদেরকে পরতে উৎসাহিত করো যখন তারা ঘর থেকে বের হয়।"

সুতরাং পাতলুন যেহেতু এক ধরনের পা'জামা এবং তাতে লজ্জা নিবারণের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়, ফিতনা সৃষ্টি হবারও আশংকা থাকেনা এবং তাতে ইসলামী লেবাসের শর্তাবলীও বর্তমান আছে, তাই পাতলুন পরাতে কোনো দোষ নেই। বরঞ্চ পর্দার জন্য এ ধরনের পোশাকই মেয়েদের জন্য উত্তম।

(৬) কাফির নারীদের পোষাকের সদৃশ যেনো না হয়। এটিও জরুরী শর্ত। কেননা, নবী করীম (সা) চাইতেন মুসলমানদের পোশাকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকুক। ইহুদী-খৃষ্টানদের পোষাক থেকে ভিন্ন ধরনের হোক। এ জন্যই তিনি অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য করা থেকে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

ক. হাকিম এবং তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

من تشبه بقوم فهو منهم - (حاكم وطبرانى)

"যে ব্যক্তি কারো সাদৃশ্য গ্রহণ করলো, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।"

খ. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

اياكم ولبوس الرهبان فانه من تزيابهم او تشبه فليس منى-

(اخرجه الطبرانى فى الاوسط)

"সাবধান পাদ্রীদের মতো পোষাক পরোনা। যে ব্যক্তি তাদের পোষাক কিংবা তাদের সদৃশ পোষাক পরবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"
[তাবরানী]

গ. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বলেন, নবী করীম (সা) একবার দু'টি হলুদ কাপড় দেখে মন্তব্য করেন ঃ

"এগুলো কাফিরদের পোষাক। তোমরা এগুলো পরো না।" [মুসলিম, নাসায়ী, আহমদ, হাকিম]

(৭) এতোটা জাঁকজমক এবং বিশেষত্ব সম্পন্ন যেন না হয়, যাতে খ্যাতি পড়ে যায়। এই শর্তটির দলীল হলো নবী করীম (সা)–এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নাম ধামের জন্য পোশাক পরে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। অতপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।" [আবু দাউদ]

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী তাঁর 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে লিখেছেন, খ্যাতিলাভের জন্য যে পোষাকই পরা হোক না কেন, চাই তা উঁচু দরের হোক যা জাঁক জমক ও গর্ব অহংকার প্রকাশের জন্য পরা হয়ে থাকে। কিংবা তা নিম্নমানের হোক, যা লোক দেখানো এবং নিজেকে আবেদ পরহেযগার বলে প্রকাশ করার জন্য পরা হয়ে থাকে, উভয় অবস্থাতেই তা এই হাদীসে বর্ণিত নাম ধামের পোষাক বলে গণ্য হবে।

ইবনে আছীর লিখেছেন, 'নাম ধাম' বলতে কোনো জিনিসকে প্রকাশ ও প্রদর্শন করাকে বুঝায়। আর নাম ধামের পোষাক মানে এমন প্রত্যেকটি পোষাক যার রং সাধারণ লোকদের পোষাকের রংয়ের চাইতে ভিন্নতর এবং এ কারণে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা চোখ উঠিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আর এর ফলে ঐ পোষাকধারী ব্যক্তি গর্বে পুলকিত হয়ে উঠে।

www.bjilibrary.com

আমাদের মতে, নাম ধামের জন্য কেবল রং-এর পার্থক্য হওয়াই জরুরী নয়, বরঞ্চ এমন প্রতিটি জিনিসই এর অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের চাইতে স্বতন্ত্র ধরনের হবার কারণে খ্যাতি লাভ করে।

সম্ভবত এ যাবতকার আলোচনা দ্বারা আমরা সেই যীনত-এর পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছি যা অন্যদের সামনে প্রকাশ করা নিষেধ। অবশ্য সুগন্ধির কথা বাকী থাকলো। আলাদা একটি অনুচ্ছেদে আমরা সুগন্ধির কথা আলোচনা করবো। আর সেভাবেই বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পর্যাপ্ত আলোচনা করা সম্ভব।

পদালংকারের যীনত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ -
(النور : ٣١)

"আর তারা যেন যমীনের উপর নিজেদের পা মেরে মেরে আওয়াজ করে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়েনা পড়ে।"

[আননূর ঃ ৩১]

এখানে আমরা যেহেতু মহিলাদের পোষাক আশাক সম্পর্কে আলোচনা করছি। যেহেতু আমরা আলোচনা করছি, সতর করার ক্ষেত্রে তাদের পোষাক কেমন হওয়া উচিত? সে কারণে পদালংকার পরে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটার মাসআলাও এ প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এ জিনিসটি আলোচনার মাধ্যমে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার বিধি বিধান সংক্রান্ত আলোচনা পরিপূর্ণ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা যখন যীনত সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান বলে দিলেন এবং কি ধরনের যীনত প্রকাশ করা জায়েয আর কি ধরনের যীনত প্রকাশ করা নাজায়েয তাও বলে দিলেন। তার পর পরই মহিলাদেরকে যমীনের উপর পা মেরে মেরে চলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আর তারা যেন যমীনের উপর নিজেদের পা মেরে মেরে আওয়াজ করে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে না পড়ে।"

অর্থাৎ মহিলারা হেঁটে চলার সময় এমনভাবে পা মেরে মেরে চলবে না, যার ফলে তাদের পদালংকারের ঝনঝনানি শব্দ শুনা যেতে পারে। কারণ এরূপ আওয়াজ শুনা যাওয়াও যীনত প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত। বরং তার চাইতে কিছুটা বেশী। কারণ, যে জিনিস প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হবে, সেটারই তো সতর করতে হবে।

জাহেলী যুগে নারীরা পদালংকার পরতো এবং চলবার সময় পা মেরে মেরে সেগুলোর ঝনঝনানি সৃষ্টি করতো যাতে করে পুরুষদের দৃষ্টি তাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তাই মুমিন মহিলাদেরকে এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

এ নির্দেশটি শুধু পদালংকারের সাথেই সম্পর্কিত নয়। বরঞ্চ মহিলারা যে কোনো অলংকারই প্রকাশ এবং তা থেকে আওয়াজ সৃষ্টি করুক না কেন, তাই এ নিষেধাজ্ঞার অন্তরভুক্ত হবে। কারণ কুরআন মজীদের বক্তব্য তো হলো ঃ 'যাতে করে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে না পড়ে।'

ইমাম ইবনে হাযম তাঁর 'আল মুহাল্লা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ এ আয়াত এ কথারই প্রমাণ যে, পায়ের গোছাও শরীরের এমন অংশ, যার সতর করা অপরিহার্য এবং উন্মুক্ত রাখা বৈধ নয়।[১]

সুন্নাতে রাসূল থেকেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় ঃ

(১) হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু উমার ইবনে হাফস আমাকে তিন তালাক প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাযির হয়ে ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে উম্মে শরীক এর ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। বললেন, তুমি উম্মে শরীকের ঘরে চলে যাও। উম্মে শরীক ছিলেন একজন সম্পদশালী আনসার মহিলা, তিনি আল্লাহর পথে প্রচুর ব্যয় করতেন। তাঁর বাড়ীতে সবসময় মেহমান থাকতো। আমি বললাম,

১. আল মুহাল্লা ঃ ৩য় খণ্ড পৃঃ ২১৬

www.bjilibrary.com

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি অবিলম্বে শরীকের বাড়ী চলে যাবো? তিনি এবার বললেন ঃ না, সেখানে যেয়ো না। তার বাড়ীতে বেশী বেশী মেহমান আসে। আমি চাই না যে, তোমার উত্তরীয় খুলে যাবে কিংবা পায়ের গোছা উন্মুক্ত হয়ে যাবে আর কোনো ব্যক্তি তোমার শরীরের এমন কোনো অংশ দেখে নেবে, যা উন্মুক্ত হওয়া মাকরূহ। তুমি বরং তোমার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্‌তুমের ঘরে চলে যাও। সে অন্ধ মানুষ। কখনো তোমার উত্তরীয় খুলে পড়লে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দু'জন একই গোত্রের লোক ছিলেন। [সহীহ মুসলিম]

(২) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

من جرثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

"যে ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের কারণে নিজের কাপড় মাটি পর্যন্ত প্রলম্বিত করে টেনে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি তাকাবেনও না।"

একথা শুনে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) নিবেদন করলেন ঃ 'মেয়েরা তাদের আঁচল কি করবে?' তিনি বললেন ঃ 'বিঘত খানেক ঝুলিয়ে রাখবে।' (কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন টাখনু গিরে পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে)। উম্মে সালামা আরয করলেন ঃ 'এমতাবস্থায় তো তাদের পা দেখা যাবে।' তিনি বললেন ঃ তাহলে যেন এক হাত পরিমাণ নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। তার চাইতে বেশী নয়।" (এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী। তিনি বলেছেন এটি সহীহ হাসান হাদীস।)

বায়হাকী বলেছেন, এ হাদীসটি থেকে প্রমাণ হয়, মহিলাদের পূর্ণ পা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

(৩) প্রথম যুগের মুসলিম মহিলাগণ (রা) ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসমূহ রক্ষা করে চলতেন। পায়ের গোছা বা পায়ের সতর উন্মুক্ত হয়ে যায় কিনা সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। এ জন্য তারা নিজেদের আঁচল এতোটা নিচের দিকে ছেড়ে দিতেন যে, উম্মুল মুমিনীন

www.bjilibrary.com

উম্মে সালামা (রা)–কে নবী করীম (সা)–এর নিকট নিবেদন করতে হয় ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল! লম্বা করে চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেবার কারণে তা তো মাটিতে লেগে নোংরা ও নাপাক হয়ে পড়ে।" নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'পরে তা ধুইয়ে নিও।' (আবু দাউদ)

(৪) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) এর নিকট গিয়ে আমি আরয করলাম ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল (সা), আমাদের ওখান থেকে মসজিদে যাবার পথটি খুবই নোংরা। বৃষ্টির সময় আমরা কিভাবে মসজিদে আসবো? তিনি জবাব দিলেন, এটি ছাড়া কি আর ভাল পরিচ্ছন্ন কোনো পথ নেই? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে বৃষ্টির সময় সেই রাস্তায় আসবে।

(সুনানে আবু দাউদ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'ইকতিদাউস্ সিরাতিল মুসতাকীম মুখালাফাতান আস্‌হাবিল জাহীম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ যেহেতু মুসলিম মহিলাদের পা এবং পায়ের গোছা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, সে কারণে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিম নাগরিকদের উপর যেসব শর্ত আরোপ করা হয় তন্মধ্যে একটি শর্ত এটাও যে, তাদের মহিলারা নিজেদের পা এবং পায়ের গোছা উন্মুক্ত রাখবে, যাতে করে মুসলিম মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়।

উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দীন ইসলামে মহিলাদের সতর কতটা গুরুত্বপূর্ণ। একথাও পরিষ্কার হলো যে, ইসলাম নারী পুরুষ তথা গোটা সমাজকে হেফাজত করার কতো সুন্দর ব্যবস্থা দান করেছে।

সুগন্ধির যীনত

(১) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لا يقبل الله صلوة امراة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة – (ابو داود)

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ তাআলা ততোক্ষণ পর্যন্ত ঐ মহিলার নামায কবুল করেননা, যে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যায়, যতক্ষণ না সে ফিরে এসে জানাবতের গোসলের মতো গোসল করে নেবে। (আবু দাউদ)

(২) জয়নব সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اذا شهدت احد اكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة (مسلم)

"যখন কোনো মহিলা এশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসবে সে যেন সেই রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (মুসলিম)

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর স্ত্রী যয়নব (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اذا شهدت احد اكن المسجد فلا تمس طيبا (مسلم)

"যখন তোমাদের কোনো মহিলা মসজিদে উপস্থিত হবে, সে যেনো সুগন্ধি স্পর্শ না করে।" (মুসলিম)

ইমাম নববী লিখেছেন, মহিলাদেরকে জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতে নিষেধ করা যাবেনা। কিন্তু তাদের মসজিদে যাবার জন্য আলেমগণ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ যে মহিলা মসজিদে যাবেন, তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করবেননা। সাজগোজ করবেননা। পায়ে এমন অলংকার পরবেননা যার আওয়াজ শুনা যাবে। চকচকে পোষাক পরবেননা। এমন পথে যাবেননা যে পথে গেলে পুরুষদের সাথে মেলামেশা হতে পারে। কোনো মহিলার যদি স্বামী থাকে এবং তিনি যদি উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে চলেন তবে তাকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু তার যদি স্বামী না থাকে এবং তিনি যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ পুরাপুরি পালন করেন, তবে তাকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হারাম।

"তোমাদের কোনো মহিলা মসজিদে এশার নামায পড়তে এলে সে যেন সেই রাতে সুগন্ধি না লাগায়।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখেছেন, এর অর্থ মসজিদে রওনা হওয়ার পূর্বে কিন্তু নামায পড়ে ঘরে ফিরে এলে সুগন্ধি লাগানো নিষেধ নয়।

www.bjilibrary.com

(৪) নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

كل عين زانية والمراة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا او كذا - يعنى زانية -

"চোখও যিনা করে। আর কোনো মহিলা যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষদের সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, সে এই এই। অর্থাৎ ব্যভিচারিনী।"

[হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী। তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন।]

(৫) রাসূল করীম (সা) বলেছেন ঃ

ايما المراة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية -

"যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, যেন তারা তার গন্ধ পায়, সে ব্যভিচারিনী। আর এরূপ প্রত্যেক চোখই যিনা করে থাকে।"

[হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নাসায়ী, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হাব্বান এবং হাকিম। হাকিম বলেছেন এটি সহীহ হাদীস।]

(৬) অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, জনৈক মহিলা আবু হুরাইরার (রা) পাস দিয়ে অতিক্রম করছিল। মহিলার শরীর থেকে ছড়াচ্ছিল সুগন্ধি। তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর দাসী'। 'তুমি কোথায় যাচ্ছো'?

ঃ মসজিদে যাচ্ছি।

ঃ গায়ে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যাচ্ছো?

ঃ হ্যাঁ,

ঃ ফিরে যাও। ঘরে ফিরে গিয়ে গোসল করো। আমি আল্লাহর নবীকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ

www.bjilibrary.com

لا يقبل الله من امراة خرجت الى المسجد لصلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل – (ابو داود ، نسائى ، ابن ماجه)

"যে মহিলা শরীরে সুগন্ধি ছড়িয়ে মসজিদে নামায পড়তে যায়, আল্লাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল করেননা, যতোক্ষণ না সে ঘরে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসবে।"

[আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

ইবনে হাজর আসকালানী 'আয্ যাওয়াজির' গ্রন্থে লিখেছেন, আমার মতে এ হাদীস থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, এ ধরনের মহিলার উপর গোসল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সে যদি গোসল করা ছাড়াই নামায পড়ে, তার নামায কবুল হবেনা। এখানে গোসল করার অর্থ এই নয় যে, তাকে অবশ্যি গোসল করতে হবে। বরঞ্চ একথার উদ্দেশ্য হলো শরীরের সুগন্ধি বিদূরিত করা।

(৭) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতাম। ইহরামের সময় আমাদের কপালে সুগন্ধিযুক্ত প্রলেপ লাগানো থাকতো। যখন আমাদের ঘামাতো, তখন এই সুগন্ধিযুক্ত প্রলেপ বয়ে আসতো কপোলে। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এই অবস্থায় দেখতেন। কিন্তু এরূপ প্রলেপ লাগাতে নিষেধ করতেননা।

শাফেয়ীদের মতে, ইহরাম বাঁধার সময় শরীরে খুশবু লাগানো মুস্তাহাব। এ কাজ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইহরামের পর পর্যন্ত সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকাতে কোনো দোষ নাই। এমনকি তা নিবিড় জাতীয় প্রলেপ করলেও কোন দোষ নেই।

উপরোল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হয়, শরীরে সুগন্ধি মেখে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া হারাম। এমনকি ইবনে হাজর আসকালানীর মতে, স্বামী অনুমতি দিলেও এমনটি করা হারাম।

ইবনে হাজর (র) লিখেছেন, এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানের মূলনীতি অনুযায়ী এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ

www.bjilibrary.com

করতে হবে সেই অবস্থার উপর যখন ফিতনা সৃষ্টি হবে। যখন ফিতনা সৃষ্টি হবার ভয় থাকবে, তখন মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ। আর যদি ফিতনা সৃষ্টি হবার ধারণা নিশ্চিত হয়, তবে হারাম। কিন্তু কবীরা গুনাহ্ হবেনা, এটা স্পষ্টতই বুঝা যায়।

এ যাবত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তার সারকথা হলো, মহিলাদের জন্য এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম যার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে, যা সম্মোহন সৃষ্টি করে এবং যার ফলে ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে। এ বক্তব্যের দলীল হলো আমাদের উল্লেখিত পাঁচ এবং ছয় নম্বর হাদীস।

আলমানাভী (র) তাঁর ফায়যুল কাদীর গ্রন্থে ইবনে দাকীকুল ঈদ–এর এ বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হলো, ঐ মহিলার সুগন্ধি লাগানো হারাম যে মসজিদে চায়। কারণ এর ফলে পুরুষের মধ্যে কামনার উদ্রেক হতে পারে। মূলত সুগন্ধি হারাম হবার কারণ এখানে "পুরুষের কামনার উদ্রেক হওয়া এবং ফিতনা সৃষ্টি হওয়া" বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ কারণ যদি বর্তমান না থাকে সে ক্ষেত্রে সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম নয়।

প্রফেসর ইউসুফ আল কারদাভী তাঁর 'হালাল ও হারাম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা পুরুষদের পাশ দিয়ে চলাফেলার সময় সজোরে মাটিতে পা মেরে মেরে চলতো, যাতে করে তাদের পদালংকার বেজে উঠে। পুরুষরা যেন শুনতে পায়। কুরআন এমনটি করতে নিষেধ করে দিয়েছে। কারণ এর ফলে কিছু পুরুষের অন্তরে তাদের প্রতি কামনার উদ্রেক হতে পারে। যেসব নারী শব্দ করে অলংকার বাজিয়ে চলে তাদের উদ্দেশ্যও অসৎ হতে পারে। নিজেদের রূপসৌন্দর্য এবং সাজসজ্জার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে।

মহিলাদের জন্য সুগন্ধি নিষিদ্ধের এই বিধান এমন সব ধরনের আতর, সেন্ট ও প্রসাধনীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যেগুলো থেকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। যেগুলো মনোমুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে এবং পুরুষদের দৃষ্টি নারীদের প্রতি আকৃষ্ট করে।

www.bjilibrary.com

অবশ্য আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভী বলেছেন, সেই সুগন্ধিই হারাম যা, বায়ু মণ্ডলে সুবাস ছড়িয়ে দেয়, যা থেকে পুরুষদের যৌনবাসনা জেগে উঠে এবং পুরুষদের আকৃষ্ট করে।

মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে এ যাবত যা কিছু আলোচনা করা হলো, তার সাথে প্রাসংগিক কথা হলো ঃ পবিত্রতা অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি, ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবার পর তুলায় সুগন্ধি লাগিয়ে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে ব্যবহার করা মুস্তাহাব, এর ফলেও অল্প স্বল্প সুগন্ধি ছড়ায়। ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, যাতে ঘর্মাক্ত হয়ে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। এসব অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার হারাম নয়।

মোট কথা, মহিলাদের জন্য সেই সুগন্ধি ব্যবহারই হারাম, যা পরিবেশকে সুবাসিত করে তোলে। যা পুরুষদের যৌন কামনা উদ্দীপ্ত করে। দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ফিতনা সৃষ্টির ভয় থাকে।

–এ হচ্ছে হানাফীদের মত। আল্লাহর জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

(الاحزاب : ٣٢)

"[লোকদের সাথে] কোমল মিষ্টি সুরে কথা বলোনা। এতে দুষ্টমনের কোন লোক লালসায় পড়তে পারে।"–(সূরা আল আহযাবঃ ৩২)

কণ্ঠস্বরেরও কি পর্দা আছে?

একটি মতে মহিলাদের কণ্ঠস্বর আওরত বা গোপন রাখার জিনিস নয়। সে কারণেই নবী করীম (সা) এর পবিত্রা স্ত্রীগণ সাহাবায়ে কিরামের সাথে কথাবার্তা বলতেন। মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে দীনের বিধান শিখতেন। অবশ্য ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকলে নারী কণ্ঠ শোনা বৈধ নয়। এমনকি তা কুরআন তিলওেয়াতের আওয়ায হলেও। এ হচ্ছে হানাফীদের মত।

আরেকটি মতে সর্ব অবস্থায় নারী কণ্ঠস্বর পর পুরুষের সামনে সতর যোগ্য। ফিতনার ভয় থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যায় আসেনা। এ হচ্ছে কোনো কোনো শাফেয়ী আলিমের মত।

কিন্তু আমাদের মতে, পর পুরুষের সামনেও মহিলাদের কণ্ঠস্বর সতর যোগ্য নয়। তবে শর্ত হলো, কথা–বার্তা সাধারণ এবং প্রচলিত ধরনের হতে হবে। ফিতনা সৃষ্টি হবার ভয় থাকবেনা এবং কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা যাবে না। আমাদের এই মতের পক্ষে দলীল–প্রমাণ রয়েছে।

১. রাসূলে করীমের (সা) পবিত্রা স্ত্রীগণ (রা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাথে কথাবার্তা বলতেন। সাহাবীগণ তাঁদের কাছ থেকে দীনের বিধি বিধান শিখতেন।

www.bjilibrary.com

২. উমার (রা) যখন মোহরের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করতে চাইলেন, তখন মসজিদের শেষপ্রান্ত থেকে এক মহিলা তাঁর বিরোধিতা করেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا – (النساء : ٢٠)

"তোমরা যদি একজন স্ত্রীর স্থলে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাকে তো বিপুল অর্থসম্পদই দিয়ে থাকোনা কেন, তবে তা থেকে কিছুমাত্র ফেরত নিয়োনা।" [সূরা আননিসা ঃ ৩০]

৩. আবু বকর (রা) এবং ফাতিমার (রা) মধ্যে যখন ফিদকের বাগান নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো, তখন ফাতিমা (রা) খলীফার কাছে গেলেন। বলা হয়, ফাতিমা (রা) তাঁর মত ব্যক্ত করা এবং নিজের অধিকার প্রমাণ করার জন্য সেখানে দস্তুরমতো একটি বক্তৃতাই প্রদান করেন। খলীফা এবং ফাতিমার মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর বাক্য বিনিময় হয়।

এসব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, নারীদের কণ্ঠস্বর 'আওরত' বা লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সাধারণ এবং প্রচলিত কথাবার্তাই বলবে। কোমল মিষ্টি কণ্ঠের কথাবার্তার জন্যে এমত প্রযোজ্য নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অকাট্য নির্দেশ রয়েছে ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ –

"কোমল মিষ্টি সুরে কথা বলোনা। এতে দুষ্টমনের কোন লোক লালসায় পড়তে পারে।"(সূরা আল-আহযাব ঃ ৩২)

নবী স্ত্রীগণকে কথাবার্তা বলার এই সভ্যরীতি শেখানোর মাধ্যমে মূলত গোটা মুমিন মহিলা সমাজকেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা পর পুরুষের সামনে কোমলকণ্ঠে মিষ্টিসুরে কথাবার্তা বলোনা। কথার মাধুর্যে পুরুষদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করোনা।

নামাযে মহিলাদের কণ্ঠস্বর

● মালেকীদের মতে, মহিলারা নামাযে পুরুষদের তুলনায় কিছুটা নিচু কণ্ঠস্বরে তিলাওয়াত করবে। এতোটা নিচু করবে যাতে কেবল

www.bjilibrary.com

সে নিজে শুনতে পায়। যেমন হচ্ছে তালবিয়া [লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা .....] পাঠের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্যে বিধান হলো, তারা নিজের শুনার মতো শব্দ করে তালবিয়া পাঠ করবে। নামাযের ক্ষেত্রেও তাদের শব্দ করার মাত্রা হবে নিজের শুনার মতো। আর যেসব নামায সশব্দে পড়া হয়না, সেক্ষেত্রে তাদের কেবল মুখ নড়বে, শব্দ বের হবেনা। এটাই হলো মালেকী মযহাবের নির্ভরযোগ্য মত। এই মতের আলিমগণের যুক্তি হলো মহিলাদের কণ্ঠস্বর ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। যার কারণে সর্বসম্মতভাবে তাদের আযান দেয়া নাজায়েয।

● শাফেয়ীদের মতে, মহিলারা নিজেদের মধ্যে সশব্দে নামায পড়তে পারবে। তবে শর্ত হলো কোনো পরপুরুষ তার কণ্ঠস্বর যেন শুনতে না পায়। আর কণ্ঠস্বর নিচু করার সীমা হলো, শুধুমাত্র নিজের শুনার মতো করে পাঠ করবে।

● হাম্বলীদের মতে, মহিলাদের জন্যে সশব্দে নামায পড়াতো সুন্নত নয়। তবে পর পুরুষ না শুনলে সশব্দে পড়াতে কোন দোষ নাই। পর পুরুষ শুনে ফেলার আশংকা থাকলে সশব্দে পড়া নিষেধ।

● হানাফীদের মতে, পুরুষদের সশব্দে নামায় পড়ার নিম্নসীমা হলো, এতোটা শব্দ করে পড়া, যাতে এমন লোকেরা শুনতে পায়, যারা তার নিকটে নয়। যেমন ইমাম কমপক্ষে এতোটা শব্দ করে কিরআত পড়বে যাতে করে অন্তত পক্ষে কাতারের লোকেরা শুনতে পায়। কেবল নিজের পাশের ব্যক্তিটির শুনার নাম জেহ্‌রে বা সশব্দে পড়া নয়। জেহেরের (সশব্দে পড়ার) সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারিত নেই। নিঃশব্দে পড়ার নিম্ন সীমা হলো পাশের একজন শুনতে হবে। এ মযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী উচ্চারণ বিশুদ্ধ হলেও কেবল ঠোঁট নাড়ানোই যথেষ্ট নয়।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী হানাফীদের মতে, যেহেতু মহিলাদের কণ্ঠস্বর 'আওরত' [গোপন বা ঢেকে রাখার জিনিস] নয়, তাই সশব্দে নামায পড়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্যে সশব্দে এবং নিঃশব্দে পড়ার সীমা একই। তবে তারা মহিলাদের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করেছেন যে, সশব্দে পড়ার ক্ষেত্রে কোমল, সুললিত ও শৈল্পিক কণ্ঠে পড়বেনা। কারণ এর ফলে শ্রোতা পুরুষের

www.bjilibrary.com

মধ্যে যৌন-বাসনা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং কোন মহিলার কণ্ঠ যদি কোমল, সুললিত ও শৈল্পিক কণ্ঠ হয়ে থাকে তবে তার কণ্ঠস্বর আওরত বা গোপনীয়। তার জন্যে সশব্দে নামায পড়া বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও যদি সে পড়ে ফেলে, তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই মহিলাদের আযান দেয়া নিষেধ।

মহিলাদের আযান

মুয়াযযিনের পুরুষ হওয়া শর্ত। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এটি সব মযহাবেরই সর্বসম্মত মত। সুতরাং কোনো নারী বা নারীভাবাপন্ন আযান দিলে তা বিশুদ্ধ হবেনা।

ইমাম শা'রানী 'কাশফুল গুম্মা' গ্রন্থে লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) মহিলাদের মধ্যে আযান দিতেন এবং নামাযে ইমামতী করতেন। কিন্তু তিনি মহিলাদেরকে পুরুষদের মধ্যে আযান দিতে নিষেধ করতেন। ইবনুল মুনযির হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আযানও দিতেন এবং ইকামতও বলতেন।

ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (بخارى ومسلم)

"[নামাযে ইমামের কোনো ভুল হয়ে গেলে] পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায করবে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, নামাযের মধ্যে যদি নিয়মের বিপরীত কিছু ঘটে এবং ইমামকে সতর্ক করা জরুরী হয়ে পড়ে তবে সুন্নাত পন্থা হলো, পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে আর মেয়েরা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে মেরে শব্দ করবে। কিন্তু খেল তামাশার মতো দু' হাতে তালি বাজানো জায়েয নয়। এরূপ তালি বাজালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এমনটি করা নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

www.bjilibrary.com

পরপুরুষের সামনে গান গাওয়া

যুক্তি বলে, যখন নামায, অন্যান্য ইবাদত এবং পর পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্যে শরীয়ত এতোটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, যা আমরা উপরে আলোচনা করে এসেছি, তখন কোনো মহিলার জন্যে পর পুরুষকে গান শুনানো আবশ্যি হারাম হওয়া উচিত।

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী তাঁর 'কাফ্‌ফুর রিয়ায়ি আন মুহাররিমাতিল লাহ্‌বি ওয়াস্‌ সিমায়ে' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "পর নারীর গান শুনা সর্বাবস্থায় হারাম। কেননা, আমাদের মযহাবে [শাফেয়ী মযহাবে] মহিলাদের কণ্ঠস্বরও আওরাত [গোপনীয়] চাই তার ফলে ফিতনা সৃষ্টি হোক কিংবা না হোক।

'রওজাতুত তালেবীন' গ্রন্থের ভাষ্য থেকেও বুঝা যায় যে, শাফেয়ী মযহাবের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হলো, গান হারাম।

ইমাম ইবনে হাজর আরো বলেন, কাজী আবু তাইয়েব আততাবারী আমাদের [শাফেয়ী] মযহাবের অন্যতম ইমাম। তিনি উল্লেখ করেছেন, গান আড়াল থেকে গাইলেও হারাম। কাজী হুসাইনও পরিষ্কারভাবে গানকে হারাম বলেছেন। তিনি একথাও দাবী করেছেন যে, এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই। কারণ এ প্রসংগে একটি সহীহ হাদীস বর্তমান রয়েছে ঃ

من استمع الى قينة صب فى اذنيه الا فك –

"যে ব্যক্তি কোনো (পেশাদার) গায়িকার গান শুনলো, তার কানে সীসা গালিয়ে ঢালা হবে।"

ইমাম ইবনে হাজর অতপর লিখেছেন ঃ "তবে সঠিক কথা হলো মহিলাদের কণ্ঠস্বর আওরত (গোপনীয়) নয়। তাদের কণ্ঠস্বর শুনা এবং শুনানোও হারাম নয়। তবে ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকলে আলাদা কথা।

কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর হারাম না হবার এই মত সেইসব কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে পযোজ্য নয়, যাতে সাধারণ গায়িকারা সুর লেলিয়ে ললিত কণ্ঠে

www.bjilibrary.com

মন মাতিয়ে তোলে। বরঞ্চ মহিলাদের কণ্ঠস্বরের এই বৈধতা কেবল সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ গানে কেবল শব্দই শুনা যায়না, বরং সেই সাথে আছে আরো অনেক কিছু। সুতরাং এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার দিকটাই প্রভাবশীল। মহিলাদের কণ্ঠস্বর আওরত কি আওরত নয় সে মতভেদ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এরূপ কণ্ঠস্বর তো সীমালংঘন এবং অশ্লীলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

এরপর ইমাম ইবনে হাজর তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে ইমাম রাফেয়ী এবং ইমাম আওযায়ীর মতামত উদ্ধৃত করেন। অতপর লিখেন ঃ

"আমি দেখছি, ইমাম রাফেয়ীও মহিলাদের গানকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। ইমাম আওযায়ী আল্লামা কুরতুবীর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ঃ যেসব আলিম গান শুনাকে মুবাহ বলেছেন, তাদেরও অধিকাংশের মত হলো, পরনারীর গান শুনা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যেই হারাম। গান, কবিতা, কুরআন তিলাওয়াত সবই এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকাই এ নিষেধাজ্ঞার কারণ।"

মহিলাদের ললিত কণ্ঠ উপভোগ করা তাদের দৈহিক সৌন্দর্য উপভোগ করারই সমতুল্য। বরঞ্চ দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতে ললিত সুরেলা কণ্ঠস্বর বিপর্যয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিক প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কেননা, সুরের সম্মোহন দেখার উদগ্র কামনা সৃষ্টি করে দেয়। দেখার চাইতে কণ্ঠস্বর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষ সহজেই ফিতনায় নিমজ্জিত হতে পারে।

মোট কথা মহিলাদের ললিত কণ্ঠস্বরে সর্বাস্থায়ই যৌন কামনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে। ইমাম আওযায়ী এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সার কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

এথেকে প্রমাণ হলো, শাফেয়ী মযহাবের তিনজন শ্রেষ্ঠ ইমাম রাফেয়ী (রা), আওযায়ী (রা) এবং ইবনে হাজর (রা)–এর মতে পুরুষের জন্যে পরনারীর গান শুনা হারাম।

ইমাম গাযালী (র) 'ইহ্‌ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

কাযী আবুত্ তাইয়্যেব লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর সাথীদের মতে গায়রে মাহরাম নারীর গান শুনা জায়েয নেই। সামনে গাইল কিংবা

www.bjilibrary.com

আড়াল থেকে, স্বাধীন মহিলা গাইল কিংবা দাসী, তবে কিছু যায় আসেনা।

ইমাম গাযালী আরো লিখেছেনঃ

ইমাম শাফেয়ী আরো বলেছেন, দাসীর মনিব যদি লোক ডেকে দাসীর গান শুনানোর আয়োজন করে, তবে সে আহমক। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালিক সাধারণভাবে গান গাইতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার মতে গান গর্হিত কাজ। তিনি গান শুনাকে বড় গুনাহ মনে করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সম্পর্কে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি আব্বাকে গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ গান অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে। আমার কাছে গান খুবই গর্হিত কাজ।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বাল আরো বলেন, ইসহাক ইবনে ঈসা আত তাবা' আমাকে বলেছেন, আমি ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মদীনার আলিমদের মতে কি কি কারণে কোন্ কোন্ ধরনের গান শুনার অবকাশ আছে? তিনি জবাব দেন ঃ আমাদের এখানে কেবল ফাসিকরাই একাজ করে।

আবদুল্লাহ আরো বলেন ঃ আমি আব্বাকে বলতে শুনেছি, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যদি সমস্ত অবকাশের [রুখসাত] সুযোগ গ্রহণ করে, যেমন, মদীনার লোকেরা গানের অবকাশ রেখেছে, মক্কার লোকেরা মুতা বিয়ের অবকাশ রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে এমন ব্যক্তি ফাসিক।

বর্ণিত আছে, মাকহুল (রা) বলেছেনঃ "গায়িকা দাসী আছে এমন কোনো ব্যক্তি যদি মরে, তবে তার জানাযা পড়া যাবেনা।"[১]

১. আবুবকর আহমদ ইবনে হারুন আল খাল্লাসঃ আল আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকারঃ পৃঃ ১৫৮–১৬০। প্রকাশকঃ দারুল ই'তেসাম।

www.bjilibrary.com

পরপুরুষের সামনে মহিলাদের গান গাওয়াকে যারা মুবাহ বলেন, তাদের দলীল

এ যাবত পরপুরুষের সামনে মেয়েরা গান গাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন ইমামের মতামত উদ্ধৃত হলো। কিন্তু এমন কিছু লোক আছেন, যারা নিজেদেরকে জ্ঞানী বলে দাবী করেন। অথচ এই মহান ইমামগণের সমস্ত মতামতকে অগ্রাহ্য করে পরপুরুষের সামনে মেয়েদের গান গাওয়াকে মুবাহ [বৈধ] বলে দাবী করেন। অবশ্য বৈধতার জন্যে তারা কিছু শর্ত যোগ করেন। তাহলো, যে গান গাওয়া হবে, তা দীনী এবং নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক হতে হবে। নিজেদের মতের সপক্ষে তারা কিছু দলীলও পেশ করেন। সে গুলো হলো ঃ

[১] জমহুর ফকীহগণের মতে মহিলাদের কন্ঠস্বর আওরত [গোপনীয়] নয়।

[২] নবী করীম (সা) যখন মদীনা আগমন করেন, তখন বনী নাজ্জার গোত্রের মহিলারা তাঁকে গান গেয়ে সম্ভাষণ জানিয়েছিল এবং তিনি এর প্রতিবাদ করেননি। [তাদের গানটির সূচনা ছিলো এরূপঃ তালাআল বাদরু আলাইনা, মিন ছানিয়াতিল বিদায়ী -----]

[৩] আইয়্যামে মিনা অর্থাৎ ঈদের দিন নবী করীমের (সা) উপস্থিতিতে আয়েশার (রা) ঘরে দু'জন বালিকা গান গেয়েছিল। কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। এমন সময় আবু বকর (রা) আসেন। তিনি কন্যার ঘরে ওদের গান শুনে সাংঘাতিক অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ্‌র ঘরে এসব শয়তানী কাজ করা হচ্ছে? নবী করীম (সা) বললেন ঃ ওদের কিছু বলোনা। কারণ আজ ঈদের দিন। [মুসলিম]

[৪] মেয়েরা যদি পরপুরুষকে গান শুনায় এবং সে গানের বিষয়বস্তু যদি দীনী এবং চরিত্রগঠনমূলক হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নাই।

তাদের পেশকৃত দলীলের জবাব

এই লোকেরা দলীল পেশ করতে গিয়ে আসলে যুক্তি পেশ করেছেন। কারণ ঃ

www.bjilibrary.com

[১] যদিও জমহুর ফকীহদের মতে মহিলাদের কণ্ঠস্বর 'আওরত' নয়। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ফকীহর মতে কিন্তু আওরত। তাছাড়া যেসব ফকীহ বলেছেন নারী কণ্ঠস্বর আওরত নয়, তারাও তাদের এমতের সাথে কিছু শর্ত যোগ করে দিয়েছেন। তাহলো, যখন ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকবেনা এবং যেসব কথাবার্তা বলা হবে সেগুলো দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তা হতে হবে। কিন্তু গান দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তা নয়। বরঞ্চ এটা একটা শিল্পকলা। কোমল ললিত সুরে গাওয়া হয়। এতে পুরুষের মনে একটা ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে।

তাছাড়া যেখানে সমস্ত ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের আযান দেয়া হারাম, সেক্ষেত্রে গান গাওয়া বৈধ হতে পারে কেমন করে?

[২] বনী নাজজারের মহিলারা 'তালাআল বাদরু আলাইনা'–এর যে গান গেয়েছিল, তাতো একেবারে হিজরতের সূচনা কালের কথা। তখন পর্যন্ত তো হিজাবের (পর্দার) আয়াতও নাযিল হয়নি। হিজাব করার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত তো নাযিল হয় ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের পর। এর ফলেই মদীনায় এমন কিছু নতুন প্রথা চালু হয়, যা এসব আয়াত নাযিল হবার পূর্বে ছিলনা।

[৩] ঈদের দিনে নবী করীমের (সা) ঘরে দু'টি মেয়ের গান গাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের প্রসংগে হাদীসে 'জারিয়াতুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'জারিয়াতুন' এমন বালিকাদের বলা হয়, বয়স কম হবার কারণে যারা সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারে। যারা এখনো বালিগ মেয়েদের কাতারে শামিল হয়নি এবং যাদের উপর হিজাবের বিধান প্রযোজ্য নয়।

'জারিয়াতুন' শব্দ দিয়ে অনেক সময় দাসীও বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ মেয়ে দু'টি যদি দাসীও হয়ে থাকে, তবুও বিষয়টির ধরনই ভিন্ন রকম হয়ে যায়। কারণ দাসীদের সতর এবং হিজাবের সীমা স্বাধীন মহিলাদের সতর এবং হিজাবের সীমা থেকে ভিন্নতর। সুতরাং দাসীদের জন্যে প্রযোজ্য বিধান স্বাধীন মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারেনা।

www.bjilibrary.com

তাছাড়া নবী করীম (সা) ঐ মেয়েদেরকে যে সময় গাইবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেটি একটি ভিন্ন ধরনের সময়। একেতো সেটা ছিলো ঈদের দিন। দ্বিতীয়ত, সেটা সাধারণ সমাবেশ ছিলনা। বরঞ্চ সেটা ছিলো আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) ঘর। সুতরাং 'ব্যতিক্রম' জিনিসের উপর 'সাধারণ' জিনিসের প্রয়োগ প্রযোজ্য হতে পারেনা।

তাছাড়া এই হাদীসটি বিশ্লেষণে গেলে দেখা যায়, আবু বকর (রা) যখন নবী করীমের (সা) ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখেন, নবী করীম (সা) বালিকাগুলোর দিকে পেছন দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। সুতরাং শরীয়তের বিধানের দৃষ্টিতে তাঁর কর্মপন্থা ছিলো সঠিক।

[৪] আমরা যদি মহিলাদের জন্যে দীনী এবং চরিত্রগঠনমূলক গান গাওয়াকে বৈধ করে দিই, তবে প্রথমত, বৈধতার এই বিশেষ ধরনের পক্ষে কোনো দলীল নেই। এই অনুমতির ফলে তো মহিলাদের জন্যে গজল এবং এমনসব প্রেমের গানও বৈধ হয়ে যায় যেগুলোর বিষয়বস্তু অশ্লীল নয়। দ্বিতীয়ত, মহিলাদেরকে যদি দীনী এবং চরিত্রগঠন মূলক গান গাওয়ার অনুমতি দেয়াই হয়, তবে পরপুরুষের সামনে ললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত এবং আযান দেয়ার অনুমতিও দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। অথচ এ দু'টি কাজই হারাম হবার ব্যাপারে ফকীহগণ সর্বসম্মত।

[৫] ইসলামী শরীয়ার একটি বড় মূলনীতি হলো, মুনকার [অশ্লীল, গর্হিত ও মন্দ] এর উৎস পথ বন্ধ করাও এতোটা গুরুত্বপূর্ণ যতোটা গুরুত্বপূর্ণ স্বয়ং মুনকারকে প্রতিরোধ করা। এই লোকগুলো শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিটির প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। মহিলাদের জন্যে গান গাওয়া যদি বৈধ হয়ে যায়, তবে তার জন্যে গান শিখাও জরুরী হয়ে পড়বে। এজন্যে তাকে গানের উস্তাদের কাছে যেতে হবে, কিংবা উস্তাদকে নিজের কাছে ডেকে আনতে হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের একত্রে বসে থাকতে হবে। এটার জন্যে নির্জন অবস্থারও সম্মুখীন হতে পারে। এরূপ মেলামেশা কি করে বৈধ হতে পারে? এর মাধ্যমে এর চাইতে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

[৬] মেয়েদের গান শুনার আয়োজন সাধারণত ফাসিক ফাজির লোকেরাই করে থাকে। সব সময় যে, পরহেযগার লোকেরাই তাদের গান শুনবে এমন কোন গ্যারেন্টি নাই। ইমাম মালিক যথার্থই বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আমাদের এখানে ফাসিক ফাজিররাই গান শুনে থাকে"

তাহলে এমন একটি অবস্থাকে আপনি কি বলবেন? গানের আসর। সেখানে অধিকাংশই ফাসিক ফাজির লোকের উপস্থিতি। সুললিত কণ্ঠে একজন মহিলা গান গেয়ে শুনাচ্ছে। ওদের অন্তরে উদগ্র যৌন কামনা জেগে উঠছে। একি কোন অবস্থাতে বৈধ কাজ হতে পারে?

www.bjilibrary.com

২০. মহিলাদের নামায সংক্রান্ত মাসআলা

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নামায

মাসিক শেষ না হতেই নামায আরম্ভ করা, কিংবা নামায পড়াকালে মাসিক আরম্ভ হলে নামায পড়া অব্যাহত রাখা হারাম। পরিমাণ যতো কমই হোকনা কেন তাতে কিছু যায় আসেনা। একইভাবে নিফাসের সময় নামায পড়াও হারাম। মাসিক চলাকালে, নিফাস চলাকালে কিংবা গোসল ফরয হবার পর অথবা বিনা অযুতে জেনে বুঝে নামায পড়া কবীরা গুনাহ। এমন কাজকে জায়েয মনে করা কুফরী। একইভাবে হায়েয, নিফাস এবং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তিলাওয়াতের সিজদা এবং কৃতজ্ঞতার সিজদা করাও হারাম।

হযরত উমার (রা) মহিলাদেরকে এশার নামায বিলম্ব না করে আগে ভাগে পড়ে নিতে বলতেন, যাতে এমনটি না হয়ে যায় যে, তাদের মাসিক শুরু হয়ে গেলো অথচ ঐ ওয়াক্তের এশার নামায পড়তে পারলনা।

ইমাম শা'বী বলেছেন, কোনো মহিলা যদি নামায পড়তে বিলম্ব করে আর তার মাসিক শুরু হয়ে যায়, তবে তাকে সেই নামাযটি কাযা করতে হবে, যার ওয়াক্ত শুরু হবার পরও পবিত্র ছিলো, কিন্তু বিলম্ব করার কারণে আদায় করতে পারেনি।

ঋতুবতী যখন পবিত্র হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ঋতুবতী যদি বেলা ডুবার আগেই পবিত্র হয়ে যায় অর্থাৎ ঋতুকাল শেষ হয়ে যায়, তবে সে যোহর এবং আসর নামায একত্র করে পড়ে নেবে। আর যদি ফজরের আগেই পবিত্র হয়ে যায়, তবে মাগরিব এবং এশা একত্রে পড়ে নেবে।

কিন্তু হযরত আবু হুরাইরার (রা) যুক্তি এর চাইতে ভিন্নতর। তিনি বলেছেন, কাফির যদি এমন সময় মুসলমান হয়, কিংবা ঋতুবতী যদি

www.bjilibrary.com

এমন সময় পবিত্র হয়, যখন কোনো নামাযের শেষ সময়, তবে তাকে কেবল সেই নামাযটিই পড়ে নিতে হবে, যার শেষ সময় অবশিষ্ট ছিলো। তাঁর দলীল হলো নবী করীম (সা)-এর এ বাণী ঃ

من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة – (بخارى و مسلم)

"যে ব্যক্তি নামাযের (জামাতের) এক রাকায়াত পেলো, তার পুরো নামাযই জামাতে নামায গণ্য হবে।" [বুখারী, মুসলিম]

নিফাসওয়ালী এবং নামায

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে নিফাসওয়ালী মহিলারা চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত নামায পড়তোনা। এ সময় আমরা মুখমণ্ডলে জাফরান এবং অরস্ দ্বারা বানানো প্রসাধনী ব্যবহার করতাম।" [সুনানে আবু দাউদ]

হায়েয ও নিফাসকালে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা নাই

হায়েয ও নিফাস চলাকালে যেসব নামায ছুটে যায়, সেগুলো কাযা করতে হবেনা। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, মুআযা (র) হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ কি কারণে মহিলাদের ঋতুকালীন রোযা কাযা করতে হয়, অথচ নামায কাযা করতে হয়না? হযরত আয়েশা (রা) জবাবে বলেন ঃ তুমি কি খারেজী?" সে বললো ঃ না, খারেজী নই, এমনিতেই প্রশ্ন করলাম।' তিনি বললেন ঃ "(কারণ আবার কি?) আমাদেরকে ঋতুকালীন রোযা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর নামায কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।" [মুসলিম]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখেছেন, হযরত আয়েশার (রা) বক্তব্য ঃ "আমাদেরকে ঋতুকালীন রোযা কাযা করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর নামায কাযা করবার নির্দেশ দেয়া হয়নি" ঋতুকালীন নামায রোযা সংক্রান্ত সর্বসম্মত বিধান। এ ব্যাপারে মুসলিম আলিমগণের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, হায়েয এবং নিফাস চলাকালে মহিলাদের জন্য নামায আদায় করা ফরয থাকেনা। এই

www.bjilibrary.com

ব্যাপারেও তাদের মধ্যে ইজমা রয়েছে, হায়েয এবং নিফাস কালের নামায কাযা করা ফরয নয়, কিন্তু রোযার কাযা করা ফরয।

আলিমগণ বলেছেন, এর কারণ হলো, নামায দৈনিক পাঁচবার পড়তে হয় বলে অনেক নামায জমা হয়ে যায়। তাই নামাযের কাযা করা কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে রোযা গোটা বছরে একমাস ফরয। মাসিকের কয়েক দিনের রোযা কাযা করা কষ্টসাধ্য নয়।

ইমাম নববী আরো বলেন, আমাদের (শাফেয়ীদের) আলিমগণের মতে, ঋতুকালের নামাযের কাযা নাই, তবে ঋতুর কারণে তাওয়াফের দুই রাকায়াত ছুটে গেলে সেই দুই রাকায়াতের কাযা করা জরুরী।

হযরত আয়েশা (রা) যে প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি কি খারেজী"? এই প্রশ্নের কারণ এই ছিলো যে, খারেজী ফেরকার লোকেরা ঋতুকালের নামাযের কাযা দেয়াকে ওয়াজিব মনে করে। কিন্তু এই মত মুসলমানদের ইজমার(ঐকমত্যের) বিপরীত। এই প্রশ্নের মাধ্যমে মূলত হযরত আয়েশা (রা) এই খারেজী মতের ভ্রান্তিই বুঝাতে চেয়েছেন।

অপর একটি বর্ণনা এরূপ ঃ হযরত আয়েশা (রা) মুয়াযাকে বলেছিলেন, তুমি কি খারেজী? নবী করীম (সা) বেঁচে থাকাকালে আমাদেরকে ঋতুকালের নামায পড়তে নির্দেশ দেয়া হতোনা। ঋতুকালীন নামাযের কাযা যদি ওয়াজিবই হতো, তবে নবী করীম (সা) অবশ্যই আমাদেরকে সে নামাযের কাযা দিতে নির্দেশ দিতেন।

ইমাম শা'রানী তাঁর 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ

"উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাকে জানানো হলো, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা) মহিলাদেরকে ঋতুকালের ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, একথা শুনে হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ তোমরা কখনো এ নামাযের কাযা করবেনা। কারণ, নবী করীমের (সা) স্ত্রীগণের যারই নিফাসের রক্ত আসতো, তিনি চল্লিশ দিন নামায পড়তেননা। নবী করীম (সা)-ও তাকে নিফাসকালের নামায কাযা করতে হুকুম করতেননা।

www.bjilibrary.com

ইস্তেহাযার রোগীর নামাযের বিধান

পবিত্রতা অধ্যায় দেখুন। সেখানে আমরা এ সংক্রান্ত যাবতীয় কথা আলোচনা করে এসেছি। এ ব্যাপারে ইমামদের মতামতও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইস্তেহাযা হলো সেই রক্ত, হায়েয এবং নিফাসের নির্দিষ্ট মুদ্দতের আগে পরে মহিলাদের বিশেষ অঙ্গ থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ হচ্ছে সেই রক্ত, হায়েয বা নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ পূর্ণ হবার পরও যে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। কিংবা সেই রক্ত, যা হায়েয এবং নিফাসের সর্ব নিম্ন মেয়াদের চাইতেও কম সময়ের জন্য দেখা যায়। কিংবা সেই রক্ত, যা মাসিক আরম্ভ হবার বয়েস হবার আগেই (অর্থাৎ নয় বছরের পূর্বে) দেখা দেয়।

ইস্তেহাযার বিরতির সময় নামায পড়া

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতে আবী হুবায়েশ (রা) নবী করীমের (সা) নিকট জিজ্ঞেস করেন ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! আমার অবিরামভাবে কুরক্ত (ইস্তেহাযা) প্রবাহিত হয়। কখনো পবিত্র হইনা। অর্থাৎ রক্ত কখনো বন্ধ হয়না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ত্যাগ করবো? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

لا ... ... انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى –

(بخارى و مسلم)

"না, নামায ত্যাগ করবেনা। কারণ, এ রক্ত ঋতুর রক্ত নয়, অন্য কোনো রগ থেকে আসছে। সুতরাং কেবল ঋতুর নির্দিষ্ট কয়দিনই নামায ত্যাগ করবে। ঋতু শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নামায পড়ো।"

অর্থাৎ ইস্তেহাযার রোগী মহিলা কেবল ঐ ক'দিনই নামায ত্যাগ করবে, যে ক'দিনের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, ঐ কদিন মাসিক চলছে। সে ক'দিন ছাড়া বাকী সময় রীতিমতো নামায পড়বে। এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ একমত।

www.bjilibrary.com

ইস্তেহাযার রক্ত পরিমাণে যতো বেশীই হোক না কেন এবং যতো দীর্ঘদিন যাবতই নির্গত হতে থাকনা কেন, তা নামাযের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশের সাত বছর অবিরাম কুরক্ত প্রবাহিত হয়। তিনি তাঁর এ রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلى وصلى

"এটা ঋতুর রক্ত নয়। অন্য কোনো রগ থেকে আসা রক্ত। সুতরাং তুমি গোসল করে নামায পড়ো।"

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, উম্মে হাবীবা তার বোন উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশের ঘরে এলে টবে গোসল করতেন আর টবের পানি রক্তের কারণে লাল হয়ে যেতো।

ইস্তেহাযা রোগীর নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন

নামাযের জন্য কুরক্তের রোগীদের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে চারটি মত রয়েছে ঃ

(১) ইস্তেহাযা রোগীর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবারমাত্র গোসল করা ওয়াজিব। আর এ গোসল করবে তখন, যখন ঋতুর রক্ত বন্ধ হবে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথা 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি। তাই সেখান থেকে প্রাসংগিক কথাগুলো পড়ে নিন।

এই মত যারা পোষণ করেন, অর্থাৎ যারা একবার মাত্র গোসল করাকে ওয়াজিব মনে করেন তাদের মধ্যে আবার দু'টি দল রয়েছে।

এক দলের মতে, একবার গোসল করবে বটে, তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য তাকে নতুন করে অযু করতে হবে। এদের দলীল হলো ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশের হাদীস (যেটি আমরা পবিত্রতা অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি)। হাদীসটি আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞ এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন। এ হাদীসে নবী করীম (সা) ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছিলেন ঃ "প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করে নেবে।"

www.bjilibrary.com

অপর দল প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করাকে জরুরী (ওয়াজিব) মনে করেননা। তারা বরঞ্চ এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন। অর্থাৎ অযু ভংগ হলে নতুন অযু করতে হবে। আর অযু ভংগ না হলে নতুন অযু করা বা না করা সে মহিলার ইচ্ছাধীন।

এ হলো মালেকী মযহাবের আলিমদের মতামত।

(২) দ্বিতীয় মত হলো, তার উপর প্রত্যেক নামাযের জন্য পবিত্র হবার গোসল করা ওয়াজিব। এঁদের দলীল হলো একটু আগে যে হাদীসটি উল্লেখ করে এসেছি সেটি। অর্থাৎ উম্মে হাবীবা (রা) তাঁর কুরক্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফতোয়া চাইলে তিনি বলেন ঃ "এগুলো ঋতুর রক্ত নয়, বরং রক্ত অন্য কোনো রগ থেকে আসছে। সুতরাং তুমি গোসল করে নামায পড়ো।" সুতরাং উম্মে হাবীবা নামাযের সময় হলে গোসল করতেন।

লাইছ ইবনে সাআদ বলেছেন ঃ ইবনে শিহাব একথা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মে হাবীবাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে বলেছেন। বরঞ্চ তিনি নিজের থেকেই প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

হযরত ইবনে উমার, ইবনে যুবায়ের এবং আতা ইবনে আবী রিবাহ থেকেও এমতই বর্ণিত হয়েছে যে, কুরক্তের রোগী মহিলা প্রত্যেক নামাযের জন্য পবিত্রতার গোসল করবে।

(৩) তৃতীয় মত হলো, দৈনিক তিনবার গোসল করবে।

এই মতের আলিমদের বক্তব্য হলো, কুরক্তের রোগী মহিলার জন্য ওয়াজিব হলো, তিনি যোহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করে গোসল করবেন এবং উভয় নামায এক ওয়াক্তে পড়বেন। মাগরিব বিলম্ব করে এশার সময় পড়বেন, এ সময় দ্বিতীয়বার গোসল করে নিয়ে মাগরিব এবং এশা একত্রে পড়বেন। ফজরের সময় তৃতীয়বার গোসল করে ফযর নামায পড়বেন। এভাবে এই আলিমগণ চব্বিশ ঘন্টায় তিনবার গোসল করা ওয়াজিব বলেছেন।

এরা নিজেদের মতের পক্ষে আবু দাউদ বর্ণিত এই হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম হাদীসটিকে সহীহ

www.bjilibrary.com

বলেছেন। হাদীসটি হলো, হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাসূলুল্লাহকে (সা) এসে জিজ্ঞেস করলেন, ওগো রাসূলুল্লাহ (সা)! ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশের কুরক্তের রোগ আছে, তিনি কিভাবে নামায পড়বেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ

لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء

غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضا فيما بين ذلك –

"সে যোহর এবং আসরের জন্য একবার গোসল করবে। মাগরিব এবং এশার জন্য একবার গোসল করবে আর একবার গোসল করবে ফজর নামাযের জন্য। এসবের মাঝখানে (নামায পড়তে চাইলে) অযু করবে।"

ইমাম শা'রানী 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, সাহলা বিনতে সাহীলের কুরক্তের রোগ লেগেই ছিলো। নবী করীম (সা) তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে নির্দেশ দেন। এটা তার জন্য কষ্টকর হয়। ফলে তিনি তাকে পুনঃ নির্দেশ দেন, সে যেন একবার গোসল করে যোহর এবং আসর নামায একত্র করে পড়ে। আরেকবার গোসল করে যেন মাগরিব এবং এশার নামায একত্র করে পড়ে আর ফজর নামাযের জন্য একবার গোসল করে এবং এগুলোর মাঝখানে যেনো অযু করে।

অপর একটি বর্ণনা হলো, নবী করীম (সা) তাকে বলেছেন, সম্ভব হলে তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে গোসল করবে। নতুবা নামাযকে একত্র করে পড়বে (সেভাবে, যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)।

(৪) চতুর্থ মত হলো, কুরক্তের রোগী মহিলা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একবার গোসল করবে।

যে আলিমরা এমত পোষণ করেন, তাদের কেউ কেউ এই গোসলটির জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি। তাদের মতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যখনই গোসল করুক, তাতে হয়ে যাবে। এ মত বর্ণিত হয়েছে হযরত আলী (রা) থেকে।

www.bjilibrary.com

আবার কারো কারো মতে, প্রথম দিন যোহর নামাযের জন্য গোসল করবে আর দ্বিতীয় দিন করবে যোহরের সময়। এ মত উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা)। তিনি বলতেন, ইস্তেহাযার রোগী মহিলা প্রতিদিন যোহরের সময় গোসল করবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং হাসান বসরী (রা)–ও এ মতই পোষণ করতেন।

ইমাম নববী (র) লিখেছেন ঃ

"জেনে রাখা দরকার, ইস্তেহাযার রোগী মহিলার কোন বিশেষ নামায বা কোন বিশেষ সময় গোসল করা ওয়াজিব নয়। বরঞ্চ তার জন্য একবার গোসল করা ওয়াজিব। তা করবে তখন, যখন ঋতুর রক্ত আসা শেষ হয়।"

প্রাচীন ও পরবর্তী জমহুর আলিমগণের এটাই মত। হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আয়েশা (রা), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (র), আবু সালামা ইবনে আবদুর রমহান (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এই মতই পোষণ করেন।

ইমাম নববী আরো লিখেছেন ঃ

"জমহুর আলিমদের দলীল হলো, গোসল প্রসংগে নীতিগত কথা হলো, গোসল জিনিসটি স্বয়ং ওয়াজিব নয়। সুতরাং শরীয়ত যেসব অবস্থার প্রেক্ষিতে গোসল করা ওয়াজিব ঘোষণা করেছে, সেসব অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হতে পারেনা। বিশুদ্ধ সনদের সাথে নবী করীম (সা) থেকেও একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি কুরস্তের রোগী মহিলাদেরকে একবার ছাড়া অন্য কোন গোসল করবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই একবারও কেবল তখনি গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তার ঋতুর রক্ত বন্ধ হবে। তিনি(সা) বলেছেন, "হায়েয আরম্ভ হলে নামায ত্যাগ করবে এবং হায়েয বন্ধ হলে গোসল করে নেবে।" এই বক্তব্যের মধ্যে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে বার বার গোসল করার অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য হাদীস বর্তমান রয়েছে সুনানে আবু দাউদ এবং বায়হাকী প্রভৃতি গ্রন্থে। তাতে নবী করীম (সা) কুরস্তের রোগী মহিলাকে একাধিকবার গোসল করার

www.bjilibrary.com

নির্দেশ দিয়েছেন। এর কোন একটি হাদীসও দলীল হিসেবে গ্রহণ করবার যোগ্য নয়। স্বয়ং ইমাম বায়হাকী এবং অন্যান্য প্রাচীন আলিমগণ এ হাদীসকে জয়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সবগুলো বর্ণনার মধ্যে বিশুদ্ধতম বর্ণনা হলো সেটি, যেটি ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম তাঁদের বিশুদ্ধ গ্রন্থ দু'টিতে সংকলন করেছেন। সেটি হলো ঃ উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশের কুরক্ত প্রবাহিত হতো। নবী করীম (সা) তাকে বলেছেন ঃ "এ রক্ত অন্য কোনো রগ থেকে আসছে। সুতরাং তুমি গোসল করে নামায পড়ে নাও।"

ফলে উম্মে হাবীবা প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করতেন। ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন ঃ

"নবী করীম (সা) তাকে শুধু এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি গোসল করে নাও। এ থেকে একথার প্রমাণ হয়না যে, তাকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" ইমাম শাফেয়ী আরো লিখেছেন ঃ

"ইনশাআল্লাহ একথাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উম্মে হাবীবা প্রত্যেক নামাযের সময় যে গোসল করতেন তা নিজের মর্জি মতোই করতেন। এমনটি করতে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর এতে তার জন্য যথেষ্ট অবকাশ ছিলো"।

আমরা এখানে নিজের লেখা থেকেই ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরলাম। ইমাম শাফেয়ীর উস্তাদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং লাইছ ইবনে সাআদ (রাহিমা হুমুল্লাহ) প্রমুখেরও এ সম্পর্কে মতামত প্রায় তারই মতামতের অনুরূপ।"

সারকথা

কুরক্তের রোগী মহিলার জন্য একবার গোসল করা ওয়াজিব। আর এ গোসল করতে হবে মাসিক বন্দ হবার পর পর। এছাড়া সে ইচ্ছে করলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতে পারে। ইচ্ছে করলে দৈনিক তিনবার গোসল করতে পারে, কিংবা, চব্বিশ ঘন্টায় একবার গোসল করতে পারে। এসব গোসল ওয়াজিব নয়। রোগী নিজে ইচ্ছে করলে এসব গোসল করতে পারে।

www.bjilibrary.com

একইভাবে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করাও ওয়াজিব নয়। তবে মুস্তাহাব।[১]

ইস্তেহাযা রোগীর নামাযের সময় করণীয়

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

"কুরক্তের রোগী মহিলার কর্তব্য হলো, তিনি অযু করবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবেন। সুপরিচ্ছন্নভাবে রক্ত পরিষ্কার করবেন। অযু বা তায়াম্মুম করার পূর্বে তিনি পানি দিয়ে তার লজ্জা স্থান ভালভাবে পরিচ্ছন্ন করে নেবেন। রক্ত প্রবাহ বন্ধ করা বা কমানোর জন্য ন্যাকড়া বা তুলা প্রবাহ স্থানে লাগিয়ে রাখবেন। এভাবে যদি রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তবে এ পন্থাই যথেষ্ট। অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এভাবে যদি রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয়, তবে আঁটসাঁট করে লেংটি বেঁধে নেবেন। আমাদের (শাফেয়ী) মযহাবে অধিক রক্ত প্রবাহিত হলে লেংটি বাঁধা ওয়াজিব। তবে এসব অবস্থায় ওয়াজিব নয় ঃ

১. যদি লেংটি বাঁধা কষ্টকর হয় এবং ক্ষতিকর আশংকা থাকে।

২. যদি তিনি রোযাদার হয়ে থাকেন। আমাদের আলিমগণের মতে অযুর পূর্বে এসব মহিলার জন্য স্বীয় লজ্জাস্থানে তুলা বা ন্যাকড়া জড়িয়ে নেয়া এবং লেংটি বাঁধা ওয়াজিব। লেংটি বাঁধার পর পরই অনতিবিলম্বে অযু করে নিতে হবে। কিন্তু কেউ যদি অযু করতে দেরী করে ফেলে এবং সময় যদি অনেকটা গড়িয়ে যাবার পর অযু করে তবে এই অযু সম্পর্কে দু'টি মত আছে। বিশুদ্ধতর মতটি হলো, এমতাবস্থায় অযু সঠিক হবেনা। এখন প্রশ্ন হলো, কোনো মহিলা যদি ন্যাকড়া বা তুলার উপর লেংটি জড়িয়ে নেবার পরও তার রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয়, তবে তার ব্যাপারে বিধান কি? এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, এখানে যেহেতু তার নিজের পক্ষ থেকে কোনো দুর্বলতা নাই, সুতরাং তার অযু নষ্ট হবেনা এবং নামাযও বাতিল হবেনা। এমনকি তিনি যদি ফরয নামাযের পর নফলও পড়তে চান, তবে একই অযুতে পড়তে পারবেন। কারণ রোগীর

১. হানাফী মযহাবে এমন প্রত্যেক লোকের জন্য প্রত্যেক নামাযে নতুন অযু করা ওয়াজিব, যার কোনো বিপত্তি আছে।

www.bjilibrary.com

পক্ষ থেকে তো এখানে কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা নাই এবং অবস্থাও তার নিজের আয়ত্তে নাই।

কিন্তু তার লেংটি বাঁধার ত্রুটির জন্য যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তবে অযু ভংগ হয়ে যাবে। আর যদি নামায পড়াকালে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ফরয নামায পড়ার পর এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে ফরয নামায তো হয়েই যাবে, কিন্তু নফল নামায আর পড়তে পারবেননা। কেননা, এতে তার নিজের দুর্বলতা বা ত্রুটি রয়েছে।"[১]

এ প্রসঙ্গে জমহুর আলিমদের মত হলো, ইস্তেহাযার রোগীর কর্তব্য হলো, তিনি কোনো ওয়াক্তের নামায পড়ার জন্যই ওয়াক্ত শুরু হবার পূর্বে অযু করবেননা। কেননা তার পবিত্রতা তো বিপত্তির কারণে প্রয়োজন। সুতরাং তিনি তখনই অযু করবেন যখন অযু করা ফরয হয়ে পড়বে।

মহিলারা কি আযানের জবাব দেবে?

মহিলাদের জন্য আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব। এমনকি হায়েয, নিফাস এবং গোসল ফরয থাকা অবস্থায়ও মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের জবাব দেয়া যাবে।

কিন্তু হানাফী মযহাবের মত ভিন্ন। তাঁদের মতে হায়েয নিফাসের সময় আযানের জবাব দেয়া মহিলাদের জন্য জরুরী নয়। কারণ, এ সময় তো তারা নামায পড়েনা। তাই এই অবস্থায় আযানের জবাব দেয়াও ঠিক নয়।

আযানের জবাব দেবার নিয়ম হলো, মুয়াযযিন যেসব বাক্য উচ্চারণ করবে, জবাবেও সেসব বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। তবে হাইয়্যাআলাস সালাহ্ এবং হাইয়্যাআলাল ফালাহ্‌র জবাবে বলতে হবে ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ফজর নামাযের আযানে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম এর জবাবে বলতে হবে ঃ সাদাকতা ও বারারতা।

---

১. শেখ সাইয়েদ সাবেক ঃ ফিক্‌হস সুন্নাহ্।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের ইকামত (এর তাকবীর) দেয়া

ইকামত বা ইকামতের তাকবীর বলতে সেই সব বাক্যের কথাই বুঝানো হচ্ছে যা উচ্চারণ করে নামায আরম্ভের ঘোষণা দেয়া হয়। অনেক ফকীহর মতে ইকামতের তাকবীর আযানের চাইতেও বড় সুন্নাত।

ইকামতের তাকবীর

মালেকীদের মতে ইকামতের তাকবীর নিম্নরূপ ঃ

اللّه اكبر ، اللّه اكبر ... ... اشهد ان لا اله الا اللّه ... ... اشهد ان محمدا رسول اللّه ... ... حى على الصلوة ... ... حى على الفلاح ... ... قدقامت الصلوة ... ... اللّه اكبر ، اللّه اكبر ... لا اله الا اللّه -

শাফেয়ীদের মত মালেকীদের মতেরই অনুরূপ। তবে শাফেয়ীদের মতে 'কাদ কা-মাতিস সালাহ' দুইবার বলতে হবে।

হানাফীদের মত ভিন্ন রকম। তাদের মতে, শুরুতে আল্লাহু আকবার চারবার বলতে হবে। শেষের আল্লাহু আকবার দুইবার এবং অন্যান্য বাক্যও দুইবার করে উচ্চারণ করতে হবে।

ইকামতের তাকবীর বলা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। ইকামতের পর যে দোয়া করা হয় তা নিষ্ফল যায়না। হযরত সহল ইবনে সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاترد على داع دعوته حين تقام الصلوة وفى الصف فى سبيل اللّه - (رواه ابو حبان)

"দোয়া প্রার্থণাকারীর দুই সময়ের দোয়া নিষ্ফল যায়না। একটা হলো নামাযে দাঁড়াবার সময়ের দোয়া আর অপরটি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে কাতারবন্দী হবার সময়ের দোয়া।" [ইবনে হাব্বান]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

الدعاء بين الاذان والاقامة لايرد – (رواه ابو داود و ترمذى و نسائى و ابن خزيمه و ابن حبان)

"আযান এবং ইকামতের মাঝখানের দোয়া বিফল যায়না।" [আবু দাউদ, তিরমিযী' নাসায়ী, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হাব্বান]

এখন প্রশ্ন হলো যেখানে মহিলারা আযানই দিতে পারেনা, সেখানে তাদের জন্য ইকামত দেয়া কি সঠিক? এ ব্যাপারে নিম্নে ফকীহদের মতামত তুলে ধরা হলো ঃ

জমহুর ফকীহদের মতে, মহিলাদের জন্য ইকামতের বিধান আযানের বিধানের মতোই। অর্থাৎ তারা ইকামত দেবেনা।

• মালেকীদের মতে, মহিলাদের একামত দেয়া ভাল কাজ। অর্থাৎ সওয়াবের কাজ, মুস্তাহাব কাজ। আর তারা ইকামতের তাকবীর না দিলেও কোন দোষ নাই। কিন্তু এক বা একাধিক বালিগ পুরুষের বর্তমানে মহিলাদের ইকামতের তকবীর দেয়া জায়েয নয়।

• ইমাম শাফেয়ীর মতে, কোন মহিলা যদি আযান এবং ইকামত দেয়, তবে এটা একটা ভাল কাজ।

• ইবনে মুনযির লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) আযানও বলতেন, ইকামতও বলতেন।

মূল মতভেদ এ বিষয়ে নয়। মতভেদ হলো, মহিলারা নামাযে ইমামতী করতে পারবে কি পারবেনা, সে বিষয়ে।

এ প্রসঙ্গে একটি মত হলো, ইবাদতের দিক থেকে সকল বিবেচনায়ই মহিলারা পুরুষের সমান। তবে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলে, সে পার্থক্য কেবল কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতেই নির্ণীত হবে। অথবা কথাটা এভাবে বলা যেতে পারে, মহিলারা কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে পুরুষদের মত আর কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে শরয়ী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে পুরুষদের চাইতে কিছুটা ভিন্নতর।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের মসজিদে যাওয়া

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, মহিলাদেরকে নামাযের জন্য মসজিদে যেতে নিষেধ করা যেতে পারেনা। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমার (রা)–এর একজন স্ত্রী ফজর এবং এশার নামায জামাতে আদায় করার জন্য মসজিদে যেতেন। তাঁকে বলা হলো, উমার (রা) তো মহিলাদের মসজিদে যাওয়া পসন্দ করেননা, তারপরও আপনি কেন যান? তিনি জবাব দেন ঃ হযরত উমার (রা) স্বয়ং কেন আমাকে নিষেধ করেনা? প্রশ্নকর্তা জবাব দেন ঃ আপনাকে বাধা দেয়া থেকে তাঁকে যে জিনিস বিরত রেখেছে, তাহলো নবী করীমের (সা) এই বাণী ঃ

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বারণ করোনা।"

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

– اذا ستاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها

"কারো স্ত্রী যদি তার কাছে মসজিদে যেতে অনুমতি চায়, তবে সে যেন বারণ না করে।" [মুসলিম]

মুসলিমেরই অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

– لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বারণ করোনা।"

এ দু'টি হাদীস এবং অনুরূপ আরো কিছু হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, মহিলাদেরকে মসজিদের জামাতে নামায পড়তে যেতে নিষেধ করা যায়না। এ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

"কিন্তু তাদের মসজিদে যাবার এ হুকুম কেবল নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষেই প্রযোজ্য হবে। হাদীসে নববীর আলোকে আলিমগণ শর্তগুলো নির্ণয় করেছেনঃ

(১) সুগন্ধি লাগানো অবস্থায় যাওয়া যাবেনা।

(২) সেজে গুজে যাওয়া যাবেনা।

(৩) এমন পদালংকার পরে যাওয়া যাবেনা যার ঝনঝনানি সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

(৪) গর্ব অহংকারের পোষাক পরে যাওয়া যাবেনা।

(৫) পথ নিরাপদ হতে হবে। অর্থাৎ পথের পরিবেশ যেন এমন হয়, যাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবার আশংকা না থাকে।

(৬) যাওয়ার সময় দৃষ্টি রাখতে হবে যেন পুরুষদের সাথে মেলামেশা না হয়।

(৭) এমন যুবতী রূপসী সুন্দরীরও মসজিদে যাওয়া ঠিক নয় যার ব্যাপারে বিপর্যয় ঘটার আশংকা থাকে।

হাদীসে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতে যে নিষেধ করা হয়েছে, এটা মাকরূহ তানযীহী পর্যায়ের। অর্থাৎ কোন মহিলার যদি স্বামী বর্তমান থাকে এবং সে মহিলা যদি উপরোক্ত শর্তাবলী পূর্ণ করে, তবে স্বামীর জন্য তাকে মসজিদে যেতে বারণ করা মাকরূহ তানযীহী। কিন্তু যে মহিলার স্বামী নেই এবং সে যদি উপরোক্ত শর্তাবলী পূর্ণ করে, তবে তাকে মসজিদে যেতে বারণ করা হারাম।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা) পক্ষ থেকে সতর্কতা

সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

"মহিলারা এখন যেসব নতুন নতুন কথা তৈরী করে নিয়েছে, এগুলো যদি রাসূলুল্লাহর (সা) বর্তমানে হতো, তবে তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।"

আসলে উম্মুল মুমিনীনের কথার অর্থ হলো, আজকাল মহিলারা ইসলামী আচার ব্যবহার বজায় রাখা ছেড়ে দিয়েছে। ইসলামী শরীয়ত মসজিদে যাবার ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, সেগুলো তারা উপেক্ষা করছে। ফলে আজকাল মেয়েদের মসজিদে যেতে ফিতনার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। আসলে তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো, মেয়েরা যদি মসজিদে যেতে চায়, তবে যেন ইসলাম প্রদত্ত শর্তাবলী মেনে নিয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম

তবে মেয়েদের জন্য নিজের ঘরে নামায পড়াই উত্তম। এতেই তাদের জন্য অধিক সওয়াব রয়েছে এবং এটাই তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। বরঞ্চ এটাই তাদের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা। এ সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

(১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে খুযাইমা হযরত উম্মে হুমায়েদ (রা) [আবু হুমায়েদ (রা)-এর স্ত্রীর] থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম-এর নিকট আরয করেছিলাম ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল! আমার বড় স্বাদ আপনার পিছে নামায পড়ি!" তিনি জবাব দেন ঃ

قد علمت انك تحبين الصلوة معى وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجدى –

"আমি জানি, আমার পিছে [মসজিদের জামাতে] নামায পড়ার বড় ইচ্ছে তোমার। কিন্তু ঘরের অভ্যন্তরীণ কক্ষে যে নামায পড়বে, তা ঐ নামাযের চাইতে উত্তম যা পড়বে ঘরের ভেতরের উন্মুক্ত জায়গায়। ঘরের ভেতরে যে নামায পড়বে, তা ঐ নামাযের চাইতে উত্তম, যা পড়বে ঘরের আঙ্গিনায়। ঘরের আঙ্গিনায় যে নামায পড়বে, তা ঐ নামাযের চাইতে উত্তম, যা পড়বে আমার এই মসজিদে।"

বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হযরত উম্মে হুমাইদ (রা) নিজ ঘরের নিভৃততম কোণে নিজের নামায পড়ার স্থান নির্ধারণ করে নেন। যতো দিন জীবিত ছিলেন, ঐ স্থানেই নামায আদায় করেছেন।

(২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে এবং তাবরানী তার মু'জিমুল কবীর গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خير مساجد النساء قعر بيوتهن –

www.bjilibrary.com

"মহিলাদের সর্বোত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘরের নিভৃততম কোণ।"

(৩) তাবরানী তার মুজিমুল আওসাত গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঃ কোনো মহিলা তার ঘরের নিভৃততম কোণে "যে নামায পড়ে, তা ঐ নামাযের চাইতে উত্তম যা পড়ে ঘরের খোলা জায়গায়। ঘরে যে নামায পড়ে তা ঐ নামাযের চাইতে উত্তম, যা পড়ে আঙ্গিনায়। আর ঘরের আঙ্গিনায় যে নামায পড়ে তা ঐ নামাযের চাইতে উত্তম যা পড়ে মহল্লার মসজিদে।"

(৪) সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

نساءكم المساجد وبيوتهن خيرلهن -لا تمنعوا

"তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করোনা। কিন্তু ঘরে নামায পড়াই তাদের জন্য উত্তম।"

(৫) তাবরানী তার মু'জিমুল কবীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"মহিলাদের সমস্ত নামাযের মধ্যে ঐ নামাযই আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক পছন্দ করেন, যা তারা নিজ ঘরের নিভৃততম কোণে পড়ে।"

মাসআলাটি প্রসংগে ফকীহদের মতামত

• মালেকীদের মতে, মসজিদের পরিবর্তে মহিলাদের নিজ ঘরে নামায পড়াই অধিকতর শ্রেয়। আর ইমাম পুরুষ হলে জামাআতে নামায পড়া তাদের জন্য সওয়াবের কাজ।

• হাম্বলীদের মতে মহিলাদের জামাআতে নামায পড়া সুন্নাত। তবে তারা পুরুষদের থেকে আলাদা নামায পড়বে, ইমাম পুরুষ হোক কিংবা মহিলা তাতে কিছু যায় আসেনা। তবে সুন্দরী মহিলাদের পুরুষের পিছে নামায পড়া মাকরূহ আর অসুন্দরীদের জন্য মুবাহ (অর্থাৎ বৈধ, তবে জরুরী নয়)।

• শাফেয়ীদের মতে, মহিলাদের ঘরে জামাতে নামায পড়া মসজিদে জামাতে নামায পড়ার চাইতে উত্তম। মহিলাদের জামাতে নামায পড়া সওয়াবের কাজ অর্থাৎ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

www.bjilibrary.com

• হানাফীদের মতে, ইমাম যদি মহিলা হয় তবে মহিলাদের জামাতে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। তবে মহিলা যদি ইমামতী করে সে ইমামতী অশুদ্ধ হবেনা এবং নামাযও হয়ে যাবে। আর ইমাম যদি পুরুষ হয় এবং জামাত যদি মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, তবে পুরুষের ইমামতী তো মাকরূহ নয়, কিন্তু ফিতনার আশংকা থাকায় মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। আর পুরুষ যদি ঘরে ইমামতী করে এবং তিনি যদি মহিলার স্বামী বা মাহরাম কেউ না হন আর তখন যদি ঘরে সেই ইমাম ছাড়া অপর কোনো পুরুষও উপস্থিত না থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির ইমামতী করা মাকরূহ। কিন্তু ঘরে যদি স্বামী বা মাহরাম ইমামতী করায় কিংবা পুরপুরুষের ইমামতির সময় যদি আরো পুরুষ উপস্থিত থাকে, তবে মাকরূহ নয়।

জামাতের নামাযে মহিলারা কোথায় দাঁড়াবে?

সুন্নাত পন্থা হলো, জামাতের নামাযে মহিলারা ইমামের এবং ইমাম ছাড়া যদি আরো পুরুষ থাকে, তবে সব পুরুষের একেবারে পেছনে দাঁড়াবে। পুরুষ যদি কেবল একজনই হয় (অর্থাৎ ইমাম) কিংবা শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী যদি জামাতে নামায পড়তে দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রেও মহিলা সোজা পিছে দাঁড়াবে।

এ মাসালায় ফকীহদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই ঃ

(১) সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) আনাস (রা) এবং তাঁর মা বা খালাকে নিয়ে জামাতে নামায পড়ান। আনাস (রা) বলেন ঃ তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে এবং মহিলাদেরকে আমাদের পিছে দাঁড় করান।

ইমাম মালিক হযরত আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটিই এভাবে বর্ণনা করেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি এবং এক এতীম বালক নবী করীম (সা)-এর পিছে সফ করে দাঁড়াই আর মহিলারা আমাদের পেছনে সফ করে দাঁড়ায়।

(২) ইমাম শা'রানী তাঁর 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বালকদের সামনে পুরুষদের সফ বানাতেন আর বালকদের সফ বানাতেন মহিলাদের সামনে।

www.bjilibrary.com

নবী করীম (সা) বলতেন ঃ "পুরুষদের সর্বোত্তম সফ হলো একেবারে সামনে সফ আর সবচাইতে মন্দ সফ হলো সর্ব পেছনের সফ। মহিলাদের সর্বোত্তম সফ হলো সর্ব পেছনের সফ আর তাদের নিকৃষ্টতম সফ হলো সর্বাগ্রের সফ।"

মহিলাদের জামাতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে আরো কিছু আদব কানুন আছে। তন্মধ্যে একটি হলো ঃ সিজদা থেকে মাথা উঠাবার সময় পুরুষরা মাথা উঠাবার আগে তারা মাথা উঠাবেনা। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাহলো ঃ সহল ইবনে সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা)–এর পেছনে পুরুষ মুক্তাদিরা কাপড়ের স্বল্পতার জন্য তহবন্দ শিশুদের মতো গলায় গিট দিয়ে বেঁধে নিতো। তখন মহিলাদেরকে বলা হতো, যতোক্ষণনা পুরুষরা সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসবে, ততোক্ষণ তোমরা সিজদা থেকে মাথা উঠাবেনা।

এ প্রসঙ্গে একটি মত হলো, তখন কাপড়ের স্বল্পতার কারণে এক কাপড় পরেই নামায পড়া হতো। লোকেরা তাদের তহবন্দ গলায় বেঁধে নিতো। ফলে রুকু সিজদার সময় কখনো কখনো তাদের সতর উন্মুক্ত হয়ে পড়তো। তাই মহিলাদের বলা হতো, পুরুষরা সোজা হয়ে বসবার আগে তোমরা সিজদা থেকে মাথা উঠাবেনা।

মহিলাদের ইমামতী

পুরুষের উপস্থিতিতে মহিলার ইমামতী করা জায়েয নাই। কারণ নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا تومن امراة رجلا – (ابن ماجه)

"কখনো কোন মহিলা পুরুষের ইমামতী করবেনা।" [ইবনে মাজাহ]

বুখারী, আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী এবং নাসায়ী হযরত আবু বাক্‌রা (রা) থেকে এবং তাবরাণী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) প্রায়ই বলতেন ঃ

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة –

www.bjilibrary.com

"সেই জাতি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারেনা যারা তাদের কর্মকাণ্ডের বাগডোর মহিলাদের উপর ন্যস্ত করে।"

নবী করীম (সা) মহিলাদেরকে ঘরে আযান দেবার স্থান ঠিক করে নেবার নির্দেশ দিতেন এবং জামাতে নামায পড়ার জন্য কোন মহিলাকে অন্য মহিলাদের ইমামতী করতে বলতেন।

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) একবার উম্মে ওরাকার (রা) ঘরে তশরীফ নেন। তিনি রাসূলুলাহর নিকট নিজ ঘরে আযান দেবার জায়গা ঠিক করে নেবার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী করীম (সা) তাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং তাকে নিজ পরিবারের মহিলাদের ইমামতী করবার নির্দেশ দেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) মহিলাদের নামাযে ইমামতী করতেন। অবশ্য সামনে না দাঁড়িয়ে মহিলাদের সাথে কাতারের মধ্যেই দাঁড়াতেন।

ফকীহদের মতামত

মহিলাদের ইমামতী প্রসঙ্গে ফকীহগণের মধ্যে নিম্নরূপ মতভেদ রয়েছে ঃ

জমহুর ফকীহদের মতে, মহিলাদের জন্য পুরুষদের ইমামতী করা জায়েয নয়। তবে মহিলাদের জন্য মহিলাদের ইমামতী করা জায়েয কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

ইমাম শাফেয়ী মনে করেন, মহিলাদের জন্য মহিলাদের ইমামতী করা জায়েয।

ইমাম মালিকের মতে, মহিলাদের জন্য মহিলাদের ইমামতী করাও জায়েয নয়।

কিন্তু ইমাম আবু সওর এবং তাবারী জমহুর ফকীহগণের সাথে মতপার্থক্য করেছেন এবং এক বিস্ময়কর মত প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে, মহিলাদের জন্য পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ইমামতী করাই জায়েয।

www.bjilibrary.com

জমহুর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলারা পুরুষদের ইমামতী করতে পারবেনা। তাঁদের এ মতের ভিত্তি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে এর কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। সুতরাং সর্বসম্মতভাবে এমনটি করা নাজায়েয। তাছাড়া মহিলাদের জন্য তো নামাযের জামাতে পুরুষদের কাতারসমূহের সর্ব পিছনে দাঁড়ানোর নিয়মই চলে আসছে। এ থেকেও বুঝা যায় মহিলাদের সামনে দাঁড়ানো জায়েয নয়। তাছাড়া নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اخروهن حيث اخرهن الله –

"মহিলাদেরকে পেছনে রাখো, যেভাবে আল্লাহ পেছনে রেখেছেন।"

যেসব আলিম মহিলাদের জন্য মহিলাদের নামাযের ইমামতী করা জায়েয মনে করেন, তারাও ইমাম মহিলাকে সামনে নয়, বরং কাতারের ভেতর দাঁড়াবার শর্তারোপ করেছেন। এ শর্তও আরোপ করা হয়েছে কোনো কোনো সম্মানিত সাহাবীর বর্ণনার ভিত্তিতেই। এদের দলীল হলো আবু দাউদে বর্ণিত সেই হাদীসটি যাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) উম্মে ওরাকার ঘরে তশরীফ নেন এবং তাঁকে তাঁর ঘরে আযানের স্থান নির্ধারণের অনুমতি দেন এবং তাকে নিজ পরিবারের মহিলাদের ইমামতী করবার নির্দেশ দেন।[১]

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হলো যে, মুক্তাদী যদি পুরুষ বা ক্লিবলিংগ হয়, তবে ইমামকে অবশ্যি পুরুষ হতে হবে। সুতরাং কোনো মহিলার জন্য পুরুষ বা ক্লিবলিঙ্গের ইমাম হওয়া বৈধ নয়। ফরয নামাযেও নয়, নফল নামাযেও নয়।

কিন্তু মুক্তাদীরা যদি মহিলা হয়, তাদের ইমামতীর জন্য ইমামকে পুরুষই হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। এ ক্ষেত্রে মহিলা এবং মহিলা ভাবাপন্নরাও ইমাম হতে পারে। এরূপ মত দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ীও। তা সত্ত্বেও শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা মহিলাদের ইমাম পুরুষ হওয়াকেই উত্তম মনে করে।

মালিকীদের মতে মহিলারা ফরয কিংবা নফল কোনো নামাযেই ইমামতী করতে পারেনা। পুরুষদের ইমামতীও নয় মহিলাদের ইমামতীও

১. ইবনে রুশদ ঃ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১ম খণ্ড, ১–৫ পৃঃ।

www.bjilibrary.com

নয়। কোনো পুরুষ বা নারী যদি কোনো মহিলার ইমামতীতে নামায পড়ে, তবে মালিকীদের ফতোয়া হলো, তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে তবে যে মহিলা ইমামতী করেছে তার নামায হয়ে যাবে। সে ইমামতীর নিয়্যত করে থাকুক বা না করে থাকুক তাতে কিছু যায় আসেনা। অর্থাৎ তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবেনা। উম্মে আইমান (রা)–এর পুত্র বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে আইমান (রা) তাঁর মত মহিলাদের ইমামতী করতেন।

হানাফীদের মতে, মহিলা যদি মহিলাদের ইমামতী করে, তবে তার ইমামতী বিশুদ্ধ হবে এবং পেছনে যেসব মহিলা নামায পড়েছে তাদের নামাযও বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু এ কাজ অর্থাৎ কোনো মহিলার ইমামতী করাটা মাকরূহ তাহরীমী।

ইমাম মহিলা কোথায় দাঁড়াবে?

কোনো মহিলা যদি মহিলাদের ইমামতী করেন, তবে তিনি মুক্তাদি মহিলাদের কাতারে তাদের সমানে দাঁড়াবেন। একথার দলীল পাওয়া যায় হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মে সালামা (রা)–এর ইমামতীতে। তাঁরা মহিলাদের ইমামতী করতেন এবং কাতারে শামিল হয়ে মহিলাদের সমানে দাঁড়াতেন। সামনে দাঁড়াতেন না।

www.bjilibrary.com

২১. মহিলাদের ঈদের নামায

মহিলারা ঈদের নামাযে যাবে কি যাবেনা সে ব্যাপারে সল্‌ফে সালেহীন[১] এবং ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ

একদল মনে করেন, ঈদের নামাযে যাওয়া মহিলাদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। সুতরাং ঈদের নামাযে যেতে তাদেরকে বারণ করা যেতে পারেনা। এ ছিলো হযরত আবু বকর, হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মত।

কেউ কেউ মহিলাদের ঈদের নামাযে যেতে বারণ করতেন, যারা বারণ করতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা), কাসেম, ইয়াহইয়া আনসারী, ইমাম মালিক এবং ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখ (র)।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (রহ) দু'টি মত দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। একটি মত অনুযায়ী মহিলাদের ঈদের নামাযে যাওয়া জায়েয। আর তাঁর দ্বিতীয় মতটি হলো, মহিলাদের নামাযে যাওয়া জায়েযনয়।[২]

হযরত উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদের সব বালিকা এবং বালি ও চাদর পরিহিতা মহিলাদেরকে ঈদের নামাযে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ঋতুবতী মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেনো ঈদের জামাত থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করে। [বুখারী, মুসলিম]

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ আমাদের (অর্থাৎ শাফেয়ীদের) আলিমগণের মতে, যেসব মহিলা সাজগোজ করেনি এবং সুন্দর কাপড় চোপড় পরেনি, ঈদের নামায পড়তে যাওয়া তাদের জন্য মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ

১. সল্‌ফে সালেহীন মানে–সাহাবায়ে কিরাম এবং শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীগণ (রা)।
২. ইমাম নববী ঃ শরহে মুসলিম, পৃষ্ঠা ৫৪১।

www.bjilibrary.com

(সা) যে চাদর পরিহিতা পর্দানশীন সকল মহিলাকে ঈদের নামাযে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো, আজকালের মতো সে যুগে ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা ছিলনা বলেই তখন নবী করীম (সা) অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের সব মহিলাদেরকে দুই ঈদের নামাযে যেতে নির্দেশ দেয়া হতো। পর্দানশীন এবং কিশোরীদেরকেও। ঋতুবর্তীদেরকেও যাবার নির্দেশ দেয়া হতো। তবে তাদেরকে বলা হতো তারা যেন ঈদের জামাত থেকে খানিকটা দূরে অবস্থান করে এবং লোকদের সাথে তাকবীর বলে। এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় ঋতুবতী এবং গোসল ফরয হয়েছে, এমন মহিলারা আল্লাহর যিক্‌র করতে পারে। তবে এরূপ মহিলাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। ঋতুবতীদেরকে নবী করীম (সা) নামাযের স্থান থেকে কিছুটা দূরে অবস্থানেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

এই উম্মে আতিয়ারই (রা) অপর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"নবী করীম (সা) আমাদের সব মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাযে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি বালিকা, বালি পরা, চাদর পরা এবং ঋতুবতীদেরকেও। অবশ্য ঋতুবতীদেরকে নামাযের জামাত থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে দোয়ায় শরীক হতে বলেছেন। আমি নিবেদন করলাম ঃ ওগো রাসূলুল্লাহ! কারো কাছে যদি বড় চাদর না থাকে, তবে সে কিভাবে ঈদের নামাযে যাবে? তিনি বলেন ঃ তার কোন(দীনী) বোন নিজের চাদরে তাকে শরীক করে নেবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামায পড়তে যান। তিনি মাত্র দুই রাকায়াত নামায পড়েন। ঐ দুই রাকায়াতের আগে পরে আর কোনো নামায পড়েননি। অতপর তিনি মহিলাদের সমাবেশের কাছে তশরীফ আনেন। বেলাল (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে দান করবার উপদেশ দেন। তাঁর উপদেশ বাণী শুনে মহিলারা নিজ নিজ গয়না, কানফুল, আংটি এবং গলার হার দান করতে থাকে। [মুসলিম]

www.bjilibrary.com

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, ঈদের দিন নবী করীম (সা)–এর সাথে আমি ঈদের নামাযে উপস্থিত হই। আমি দেখলাম, তিনি খুতবার পূর্বে নামায পড়িয়েছেন। নামাযের জন্য আযানও দেয়া হয়নি। ইকামতও নয়। অতপর তিনি বেলালকে ধরে দাঁড়ান এবং লোকদের আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দেন। আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেন। অতপর সমবেত মহিলাদের নিকট তশরীফ নেন এবং তাদেরকে নিম্নরূপ উপদেশ প্রদান করেন ঃ

"হে নারী সমাজ! তোমরা দান করো। কারণ তোমাদের বেশীরভাগই জাহান্নামের জ্বালানি হবে। একথা শুনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল (সা)! এমনটি কেন হবে? তিনি বললেন ঃ কারণ, "তোমরা অধিক অধিক বদনাম করে বেড়াও এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করে থাকো।"

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ অতপর মহিলারা নিজেদের অলংকারাদি দান করতে শুরু করে। তারা বেলালের রুমালে নিজেদের কানফুল এবং আংটি প্রভৃতি ফেলতে থাকে।

---

www.bjilibrary.com

২২. মহিলাদের জানাযার নামায

জানাযা হলো সেই নামায, যা মৃত ব্যক্তির গোসল এবং কাফনের পর তার জন্য পড়া হয়ে থাকে। জীবিত মুসলমানদের উপর এ নামায ফরযে কিফায়া। সুতরাং যদি কিছু লোক এমনকি একজন লোকও যদি জানাযা পড়ে, তবে অন্য মুসলমানদের উপর থেকে এই ফরয দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। একজন বুঝের বালকও যদি একা বা তার সাথীদের নিয়ে জানাযা পড়ে নেয়, তবে অন্যদের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষ কিংবা বুঝের বালকের উপস্থিতিতে যদি কোনো মহিলা একা বা তার পেছনে পুরুষ বা বালকরাও নামায পড়ে তবু মুসলমানদের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হবেনা। তবে একজন পুরুষ বা বুঝের বালকও যদি বর্তমান না থাকে, সে ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য জানাযা পড়া ওয়াজিব হবে এবং তাদের জানাযা পড়ার মাধ্যমে অন্য মুসলমানদের উপর থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে। মহিলারা জানাযা পড়লেও জামাতে পড়াই সুন্নাত।

মহিলারা জানাযা পড়ে নেবার পর যদি কোনো পুরুষ উপস্থিত হয়ে যায়, তবে তার জন্য জানাযা পড়া জরুরী নয়। কিন্তু পুরুষের অবর্তমানে যদি মহিলারা নামায আরম্ভ করে দেয় এবং শেষ হবার আগেই যদি কোন পুরুষ উপস্থিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় সে পুরুষের জন্যও কি জানাযা পড়া জরুরী? এটি এমন একটি প্রশ্ন, যার সুস্পষ্ট জবাব দেয়া মুশকিল। তবে কিয়াসের সাদৃশ্য থেকে মনে হয় এমতাবস্থায় ঐ পুরুষের উপরও জানাযা পড়া জরুরী।

মহিলারা কি কফিনের সাথে যাবে?

আলোচনা চলছিল জানাযার নামায সম্পর্কে। এখন প্রশ্ন হলো, মহিলারা কফিনের সাথে যেতে পারে কি? রাসূলে করীম (সা) মহিলাদেরকে কফিনের সাথে (জানাযার অনুসরণ করতে) যেতে নিষেধ করেছেন। হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেছেন, আমাদের মহিলাদেরকে

www.bjilibrary.com

জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হতো। কিন্তু এ ব্যাপারে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করা হতোনা। [মুসলিম]

অর্থাৎ জানাযার সাথে যাওয়া মহিলাদের জন্য হারাম নয়। মাকরূহ তান্‌যীহী।

• জমহুর আলিমদের মত হলো, মহিলাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করতে হবে। এ হচ্ছে হানাফীদের মত।

• শাফেয়ীদের মত হলো, মহিলাদের জানাযার সাথে যাওয়া মাক্‌রূহ। হারাম নয়।

কিন্তু মদীনার আলিমগণ মহিলাদেরকে জানাযার সাথে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মালিকও এ কাজকে জায়েয মনে করেন। অবশ্য তাঁর মতে যুবতীদের জানাযার সাথে যাওয়া মাক্‌রূহ।

তবে এ ব্যাপারে জমহুর আলিমদের মতই বিশুদ্ধতম মত।

মাইয়্যেতের জন্য কান্নাকাটি করা

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه – (بخارى و مسلم)

"পরিবারের লোকেরা যদি মাইয়্যেতের জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করে তবে মাইয়্যেতকে আযাব দেয়া হয়।"

[বুখারী, মুসলিম]

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমারের (রা) আহত হবার খবর শুনে হযরত সুহাইব (রা) মদীনায় আসেন এবং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। তার কান্না দেখে উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ কাঁদছো কি কারণে? আমার জন্য কাঁদছো? সুহাইব জবাব দেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্যই কাঁদছি। তার জবাব শুনে উমার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

من يبكى عليه يعذب –

" যার জন্য কান্নাকাটি করা হয় তাকে আযাব দেয়া হয়।"

www.bjilibrary.com

এসব হাদীসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে আলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

জমহুর আলিমদের মত হলো, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার জন্য কান্নাকাটি করার অসীয়ত করে যায় এবং সে অনুযায়ী যদি তার জন্য কান্নাকাটি করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রেই তার মৃত্যুর পর তার পরিজনের কান্নাকাটিতে তাকে আযাব দেয়া হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে নির্দেশদাতা হিসেবে তার শাস্তি হবে। কিন্তু যে মাইয়্যেত এমনটি করার নির্দেশ দিয়ে যায়নি, বরং নিজেদের উদ্যোগেই তার পরিজন তার জন্য কান্নাকাটি করে, তার আযাব হবেনা। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى - (الانعام : ١٦٤)

"কোনো বোঝা বহনকারী পরের বোঝা টানবেনা।"

[আনআম ঃ ১৬৪]

এই আলিমদের বক্তব্য হলো, জাহেলী যুগে আরব দেশে মরার আগে লোকেরা নিজের জন্য কান্নাকাটি করবার অসীয়ত করে যেতো। এটা সে যুগের প্রথা ছিলো। সুতরাং এই হাদীসের বক্তব্য যদিও সাধারণ বলে বুঝা যায়, কিন্তু এর প্রয়োগ হবে বিশেষ ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মাইয়্যেত যদি তার জন্য কান্নাকাটি করবার অসীয়ত করে গিয়ে থাকে, কেবল সে ক্ষেত্রেই আযাবের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।

আরেকদল আলিমের মত হলো, এই হাদীসের বক্তব্য ঐ ব্যক্তির প্রতিও প্রযোজ্য হবে, যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য কান্নাকাটি করার অসীয়ত করেছে আর ঐ ব্যক্তির প্রতিও প্রযোজ্য হবে, যে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেনি। কিন্তু যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার জন্য কান্নাকাটি করতে নিষেধ করে গেছে, অথচ তারপরও তার পরিজন তার জন্য কান্নাকাটি করেছে, চিৎকার মাতম করেছে, এর জন্য মৃত ব্যক্তির আযাব হবেনা। কারণ এতে তার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার সাআদ ইবনে উবাদার (রা) অসুখ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখতে যান। তাঁর সাথে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী (রা)। নবী করীম (সা) তাঁর নিকট পৌছলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ অবস্থা

www.bjilibrary.com

দেখে তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে? লোকেরা বললো ঃ 'জী-না, হে আল্লাহর রাসূল (সা)।' অতপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে সবাই কাঁদতে আরম্ভ করেন। তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ

الا تسمعون ان اللّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب

ولكن يعذب بهذا (واشارالى لسانه) اويرحم -

"শোনো! আল্লাহ তাআলা চোখের পানি এবং হৃদয়ের বেদনার জন্য আযাব দেননা। বরঞ্চ তিনি এটার জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন (একথা বলে তিনি তার মুখের দিকে ইঙ্গিত করেন) অথবা দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।"

সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول ما يسخط اللّه -

"চোখ অশ্রু ঝরায়। হৃদয়ে বেদনা জাগে। কিন্তু আমরা মুখে এমন কিছু বলবোনা, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন।"

আংশিক মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত যে, মৃতের জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা এবং শোক গাঁথা গাওয়া নিষেধ। তবে চোখের পানি ফেলা নিষেধ নয়।

যেসব মহিলা বিলাপ করে কান্নাকাটি করে, তাদের প্রসঙ্গেও বেশ কিছু হাদীস্‌ আছে। যেমন ঃ

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ মালেক আশআরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها

سربال من قطران ودرع من جرب -

"যেসব নারী মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করে, তারা যদি নিজের মৃত্যুর আগে তওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন

www.bjilibrary.com

তাদেরকে এমনভাবে উঠানো হবে যে, তার পরণে থাকবে আলকাতরার পরিধেয় এবং খুজলী পাঁচড়ার কামিছ।"

মৃতের জন্য শোক পালন

সহীহ বুখারীতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এমন কোনো মহিলার মাইয়্যেতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। তবে স্বামীর ব্যাপারটি আলাদা। (কেননা স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাদেরকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয় আর শোকের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত)।

মহিলারা কি কবরস্থানে যেতে পারে?

উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কবর পরিদর্শন (যিয়ারত) করা মুস্তাহাব। এতে পরিদর্শনকারীর অন্তরে মৃত্যু এবং পরকালের ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ হয়। তাছাড়া পরিদর্শনকালে মৃতদের জন্য দোয়াও করা হয়ে থাকে।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد فى زيارة امه ، فزوروها فانها تذكر الاخرة – (مسلم وابوداود والترمذى وابن حبان والحاكم)

"আমি তোমাদেরকে কবর পরিদর্শন করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু মুহাম্মদের (সা) মাতার কবর পরিদর্শনের অনুমতি মিলেছে। সুতরাং এখন থেকে তোমরাও কবর যিয়ারত করো। কারণ, কবর পরপারের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" [মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকিম]

নবী করীম (সা) নিজে ওহুদের শহীদগণের কবরগাহে এবং জান্নাতুল বাকী'র কবরস্থানে গমন করতেন এবং তাদের সালাম করতেন, তাদের জন্য দোয়া করতেন ঃ

www.bjilibrary.com

السلام عليكم اهل الديار من المومنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافية -

(مسلم و احمد و ابن ماجه)

"হে মুমিন ও মুসলিম ঘরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

[মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ]

মহিলাদের কবরস্থানে যাবার ব্যাপারে মতভেদ

একদল আলিমের মতে মহিলাদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া মাকরূহ। এটা মাকরূহ তাহরীমীও হতে পারে আবার কারো মতে মাকরূহ তানযীহীও হতে পারে (অর্থাৎ কাজটা জায়েয তবে না করাই ভাল)। এঁদের দলীল হলো আবূ হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) সেসব মহিলাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন, যারা বেশী বেশী কবরস্থানে যায়। [মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী]

কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে, কোনো প্রকার ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা না থাকলে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া জায়েয। তাদের মতের সপক্ষে দলীল হলো ঃ

(১) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি কবরস্থানে গেলে কি বলবো? নবী করীম (সা) জবাব দিলেন, তুমি বলবে ঃ

قولى السلام عليكم اهل الديار من المومنين والمسلمين -

"হে মুমিন ও মুসলিম ঘরবাসী! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক।" [মুসলিম]

(২) বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন, এক মহিলা কবরের উপর বসে বসে কাঁদছে। তিনি মহিলার কণ্ঠ থেকে কিছু অপসন্দনীয় কথা শুনে তাকে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

اتقى الله واصبرى –

"আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।" কিন্তু তিনি মহিলাটির কবরে আসার ব্যাপারে কিছু বলেননি।

(৩) হাকিম তাঁর 'আল মুসতাদরিক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) প্রত্যেক জুমার দিন তাঁর চাচা হযরত হামযার (রা) কবরে যেতেন।

(৪) আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) বর্ণনা করেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) একদিন কবরস্থান পরিদর্শন করে ফিরে এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেন ঃ 'আমার ভাই আবদুর রহমানের কবর থেকে।' আমি নিবেদন করলাম ঃ 'নবী করীম (সা) কি কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেননি?' তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, প্রথমে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরে অনুমতি দিয়েছেন।" [মুসতাদরিকে হাকিম]

এই বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণ হয়, নবী করীম (সা) যে, [আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীসে] অধিক অধিক কবরে গমনকারিনীদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, তা কেবল ঐ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকবে। কিংবা ঐ মহিলার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে কবরে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজ করে। যেমন চিৎকার করে কান্নাকাটি করা ইত্যাদি। তাছাড়া হাদীসে 'কবরে অধিক অধিক গমনকারিনীর' প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, মহিলাদের অধিক অধিক, ঘন ঘন বা বারবার কবরস্থানে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ এর ফলে বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয়ের আশংকা থাকে। এরফলে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে, প্রদর্শনী হতে পারে, পর্দার লংঘন হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব জিনিস থেকে যদি আত্মরক্ষা করা যায়, তবে মহিলাদের জন্য কবর পরিদর্শনে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। কারণ পুরুষের মতো তাদের মৃত্যুর কথা, পরকালের কথা স্মরণ হওয়া দরকার।

এভাবেই বাহ্যিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই হাদীসগুলোতে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। এ কথাই বলেছেন প্রখ্যাত হানাফী আলিম আল্লামা সিরাজ এবং

www.bjilibrary.com

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী। সবচাইতে সঠিক কথাটি বলেছেন শাইখ শরনবালী। তিনি বলেছেন, কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ সংঘটিত হবার আশংকা না থাকলে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই কবরস্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু কবরস্থানে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজ করলে পুরুষদেরও সেখানে যাওয়া মাকরূহ।

এ প্রসঙ্গে 'আল বাহার' গ্রন্থের গ্রন্থকার শাফেয়ী মযহাবের আলিমগণের দুটি মত উদ্ধৃত করেছেন। একটি মত জমহুর আলিমদের মতের সমর্থক। অর্থাৎ মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া মাকরূহ। আর দ্বিতীয় মতানুযায়ী মাকরূহ নয়। অতপর গ্রন্থকার লিখেছেন, আমার মতে অধিক সঠিক মত হলো, ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া মাকরূহ নয়।

আল্লামা ইবনে কুদামা তাঁর 'আল মুগনী' গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। একটি মতানুযায়ী মহিলাদের গোরস্তানে যাওয়া মাকরূহ তানযীহী। অপর মতটি অনুযায়ী মাকরূহ নয়। মাকরূহ না হবার পক্ষে তিনি ইবনে আবু মুলাইকার সেই হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেটি আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি।

দুররে মুখতার এবং অন্যান্য ফিক্‌হের গ্রন্থ অনুযায়ী হানাফীদের মতে, পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই জন্য কবরস্থানে যাওয়া মুস্তাহাব এবং সওয়াবের কাজ। কারণ, হাদীসের বক্তব্য সাধারণ। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত।

একটি মত এ রকমও আছে যে, মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া হারাম। কিন্তু 'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সঠিক কথা হলো মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি প্রমাণিত হয়।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ

(১) মহিলাদের যাকাত সংক্রান্ত বিধান

(২) মহিলাদের দান সদকা

(৩) মহিলাদের রোযার বিধান

(৪) রোযা ভাংগার অবকাশ

(৫) মহিলাদের রোযা সংক্রান্ত আরো কিছু বিধান

(৬) রোযার কাযা এবং ফিদইয়া

(৭) মহিলাদের ইতেকাফ

(৮) মহিলাদের হজ্জ

(৯) ইহরাম

(১০) মহিলাদের ইহরামের নিয়ম

(১১) মহিলাদের ইহরামের পোশাক

(১২) ইহরামের সময় মহিলাদের মুখমণ্ডল আবৃত করা প্রসঙ্গ

(১৩) ইহরামের সময় যেসব কাজ হারাম

(১৪) ইহরাম অবস্থায় সহবাস

(১৫) হজ্জের আরকানসমূহ ও কুরবানী

(১৬) পাথর মারা

(১৭) তাওয়াফ

(১৮) মদীনায় সফর

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- পর্দা ও ইসলাম–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- স্বামী স্ত্রীর অধিকার ,,
- মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী ,,
- মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়–অধ্যাপক গোলাম আযম
- মহিলা সাহাবী–তালিবুল হাশেমী
- সংগ্রামী নারী –মুহাম্মদ নূরুয্যামান
- মহিলা ফিক্‌হ ২য় খণ্ড– আল্লামা আতাইয়া খামীস
- ইসলাম ও নারী –মুহাম্মদ কুতুব
- ইসলামী সমাজে নারী–সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা –আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
- আল কুরআনে নারী ১ম খণ্ড –অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
- আল কুরআনে নারী ২য় খণ্ড ,,
- একাধিক বিবাহ –সাইয়েদ হামেদ আলী
- নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার –শামসুন্নাহার নিজামী
- নারী মুক্তি আন্দোলন ,,
- পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন ,,
- দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব ,,
- আদর্শ সমাজ গঠনে নারী ,,
- পর্দা কি প্রগতির অন্তরায় ? –সাইয়েদা পারভীন রেজভী
- পর্দা প্রগতির সোপান –অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম
- বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া- মোঃ আবুল হোসেন বি, এ